Based on The New Case for Gold by James Rickards

গোল্ড ইজ মানি

স্বর্ণ, কাগুজে টাকা, বৈশ্বিক মুদ্রাযুদ্ধ ও কিছু অজানা সত্য

জেমস রিকার্ডস

অনুবাদ ও সম্পাদনা
রাকিবুল হাসান

লেখক পরিচিতি

জেমস রিকার্স

জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি, পল এইচ নিটজা স্কুল অব এডভান্সড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ এবং ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া ল স্কুলে পড়াশোনা করেন। ব্যাচেলর অব আর্টস, অর্থনীতি এবং আইন বিষয়ক একাধিক ডিগ্রি রয়েছে। কর্মজীবনে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর বিশ্ব অর্থনীতির প্রধান কেন্দ্র ওয়াল স্ট্রিটে কাজ করেছেন। সিটিব্যাংক, লং টার্ম ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং ক্যাক্সটন এসোসিয়েটসে শীর্ষপদে ছিলেন। ১৯৯৮ সালে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের সাথে আলোচনা করে লং টার্ম ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টকে দেউলিয়াত্বের হাত থেকে বাঁচানোর প্রধান মধ্যস্থতাকারী ছিলেন।

দুই-দুইটি বেস্ট সেলার বইয়ের লেখক।

বর্তমানে তিনি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অর্থব্যবস্থা ও মূল্যবান ধাতু বিশেষজ্ঞদের একজন। দ্য ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস, নিউইয়র্ক টাইমস এবং ওয়াশিংটন পোস্ট-সহ বহু পত্রিকার উপ-সম্পাদকীয় লেখেন।

২০১১ সালে প্রকাশিত কারেন্সি ওয়ার্স তার প্রথম বই। অর্থনৈতিক সংকটকে কেবল রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ না রেখে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেন। ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয় দ্য ডেথ অব মানি। এই দুটি বই, নিউইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলার। তবে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা হিসেবে বিবেচিত হয় ২০১৬ সালে প্রকাশিত, দ্য নিউ কেস ফর গোল্ড।

অন্যান্য রচনাবলির মধ্যে রয়েছে—

দ্য বিগ ড্রপ, ২০১৫
দ্য রোড টু রুইন, ২০১৬
আফটারম্যাথ, ২০১৯
দ্য নিউ গ্রেট ডিপ্রেশন, ২০২০

বর্তমানে তিনি অর্থনীতি বিষয়ক নিউজলেটার, দ্য স্ট্রাটেজিক ইন্টেলিজেন্সের সম্পাদক এবং জেমস রিকার্ডস প্রজেক্টের ডিরেক্টর। এই প্রজেক্টের অধীনে ভূ-রাজনীতি ও বিশ্ব-পুঁজির জটিল এবং বহুমাত্রিক বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা করা হয়।

গোল্ড ইজ মানি

স্বর্ণ, কাগুজে টাকা, বৈশ্বিক মুদ্রাযুদ্ধ ও কিছু অজানা সত্য

ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স
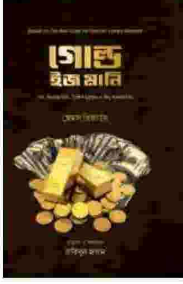
গোল্ড ইজ মানি
মূল : জেমস রিকার্ডস
অনুবাদ : রাকিবুল হাসান

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০২২

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
সিদ্দিক মামুন

প্রকাশক
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

অফিস : ৭/বি পি কে রায় রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
✆ ০১৭১৬ ৭৯ ৭৫ ৪৯

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : বইফেরি ৯ পি কে রায় রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
✆ ০১৭৫৯ ৮৭ ৭৯ ৯৯

মুদ্রণ
মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com – wafilife.com

মুদ্রিত মূল্য
২২০ ৳ মাত্র

উৎসর্গ

মুফতি শাব্বির আহমদ
যার দারস আমার অর্থনীতির হাতেখড়ি!

সূচি

তৃতীয় অধ্যায়

স্বর্ণবিরোধীদের যুক্তিখণ্ডন

চতুর্থ অধ্যায়

স্বর্ণ এবং ফেডারেল রিজার্ভ

পঞ্চম অধ্যায়

গোল্ড ইজ মানি (স্বর্ণই অর্থ)

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বর্ণই ইনস্যুরেন্স

সপ্তম অধ্যায়

স্বর্ণ পরিবর্তনহীন

অষ্টম অধ্যায়

স্বর্ণ স্থিতিস্থাপক

নবম অধ্যায়

স্বর্ণসঞ্চয় পদ্ধতি

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মদ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বইটি প্রকাশ করার পূর্ব মুহূর্তে আমি বিগলিত হৃদয়ে মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যার তাওফিক ছাড়া কোনো কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়।

খুব সম্ভবত এই বইটি প্রকাশের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় এটি, যা আমরা এখন অতিক্রম করছি। মার্কিন আইনজীবী ও নিউইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার রাইটার জেমস রিকার্ডস *The New Case for Gold* নামে বইটি লিখেছেন ২০১৬ সালে। তবে সেই সময়ে বসে তিনি যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার অনেক কিছুই এখন; বিশেষত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের যেকোনো সময়ের চেয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার এখন অনেক বেশি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া রয়েছে, কিন্তু বর্তমানে সেটা আর স্বাভাবিক পর্যায়ে নেই। এই সংকটের কারণ কী? আমরা সহজেই সকল অভিযোগের তির সরকারের দিকে নিক্ষেপ করি, কিন্তু এত সহজ হিসেব-নিকেশ সবখানে চলে না। তা ছাড়া এমন সহজ অভিযোগ পারতপক্ষে আমাদের সমস্যার সমাধানে কার্যকরী কোনো প্রভাব ফেলে না। আসলে যেকোনো সংকট নিরসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে সমস্যার গোড়া চিহ্নিত করা, তারপর সে অনুযায়ী উত্তরণের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা।

বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, বর্তমান বিশ্বের মুদ্রাব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক সিস্টেম কীভাবে চলছে, বাংলাদেশের ৯৯% শিক্ষিত মানুষ এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন না। এমনকি অর্থনীতির ছাত্র, শিক্ষক, প্রফেসর এবং বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চস্তরের কর্মকর্তাদের ব্যাপারেও এমন ধারণা পোষণ করেন জেমস রিকার্ডস। অর্থনীতিতে নানান সংকট ও গোলযোগের পেছনে এই অজ্ঞতাই সবচেয়ে বেশি দায়ী। আমি মনে করি, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অর্থনীতির ছাত্র, শিক্ষক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যেকোনো স্তরে কর্মরত আছেন, এমন

সকলেই উপকৃত হবেন বইটি থেকে। আর তখনই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

বইটি পড়ার আগে অবশ্যই লেখকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নেবেন। কারণ এখানে হয়তো এমন অনেক তথ্যই পাবেন, যা ইউটিউব-ফেসবুকের সস্তা কন্টেন্টে কিংবা কোনো সাধারণ হুজুরের মুখে শুনেছেন এবং যথারীতি অর্থনীতি বিষয়ে তাদের অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড নেই ভেবে উপেক্ষা করেছেন, হয়তো গতানুগতিক এমন হাজারো বিষয়ের মতো ষড়যন্ত্রতত্ত্ব ভেবেছেন। জেমস রিকার্ডসকে সেই দৃষ্টিতে বিচার করার কারণ নেই। তা ছাড়া লেখক যতটা ভারী আলাপ করেছেন, ততটা ভারী অ্যাকাডেমিক ও প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড তার আছে কি না, এ বিষয়েও আপনাকে নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে হবে।

গত শতাব্দীর পুরো অর্থব্যবস্থা এবং কারেন্সি সিস্টেমকে বিশ্লেষণ করে এই সামগ্রিক ব্যবস্থাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন লেখক। অর্থের সাথে স্বর্ণের সম্পর্ককে সামনে রেখে কিছু সমস্যা, সম্ভাবনা এবং নতুন চিন্তা উপস্থাপন করেছেন তিনি। সহজভাবে বলতে গেলে স্বর্ণের সাথে সম্পর্কহীনতাকেই প্রচলিত অর্থ ও মুদ্রাব্যবস্থার সকল সমস্যার জন্য দায়ী করেন রিকার্ডস এবং উত্তরণের একমাত্র পথ হিসেবে স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি উপস্থাপন করেন। তিনি মনে করেন যে, তার এই প্রস্তাবনা বর্তমান বিশ্ব মোড়লরা স্বপ্রণোদিতভাবে মেনে না নিলেও খুব শীঘ্রই সময়-ই তাদেরকে তা মানতে বাধ্য করবে। ফলে একজন প্রবীণ বিনিয়োগ উপদেষ্টা হিসেবে তিনি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ দেন যে, তাদের সম্পদের কিছু অংশ স্বর্ণে প্রতিস্থাপন করে রাখতে, যেন দুর্যোগের সময় সব হারিয়ে পথে বসতে না হয়। তাই আমি মনে করি, বইটি সাধারণ পাঠকদের জ্ঞানের ভান্ডারে প্রবৃদ্ধি আনলেও বড় বিনিয়োগকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোই কার্যত এর থেকে বৈষয়িকভাবে বেশি লাভবান হতে পারবেন। অতএব, সাধারণ পাঠকদের কাছে অনুরোধ থাকবে, বইটি আপনার পড়া হলে এমন কারও হাতে পৌঁছে দিন, যিনি বৈষয়িকভাবে এর থেকে উপকৃত হতে পারবেন।

উল্লেখ্য যে, সাধারণ পাঠকদের প্রতি লক্ষ রেখে আমরা বইটির গতানুগতিক ধারার অনুবাদ এড়িয়ে গেছি। লেখকের কথাকে যথাসম্ভব সহজ করার জন্য কিছু অর্থনৈতিক পরিভাষার ব্যাখ্যা এবং বাংলাদেশের

প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কিছু উদাহরণ মূল লেখার সাথে সংযোজন করা হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবেই লেখকের চিন্তার বাইরে নতুন কিছু যুক্ত করা হয়নি। জটিল একটি টপিকের এমন সাবলীল ও প্রাঞ্জল অনুবাদের পুরো কৃতিত্ব মননশীল অনুবাদক রাকিবুল হাসান ভাইয়ের প্রাপ্য। আমি তার উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি। নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি যে, অনুবাদ, না মৌলিক লেখা পড়ছেন—পাঠকের উপলব্ধি করতে বেগ পেতে হবে।

সর্বশেষ পাঠকদের বলতে চাই যে, বইটি যদি আপনাদের জ্ঞান বৃদ্ধি এবং বাস্তব জীবনে কিছুটা হলেও কাজে আসে, তাহলেই আমাদের প্রচেষ্টা সফল এবং সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

বইটি পড়ে ভালো লাগলে অনলাইনে এবং অফলাইনে আপনার অভিব্যক্তি অবশ্যই শেয়ার করবেন। আপনাদের যেকোনো পরামর্শ ও মতামত আমাদের জানাতে ভুলবেন না। বইটিকে আলোর মুখ দেখাতে নানান স্তরে যারা এর সাথে জড়িত ছিলেন তাদের সবাইকে, এবং বিশেষ করে প্রিয় পাঠক আপনাকে, অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিনীত

আবদুর রহমান আদ-দাখিল
ডেমরা, ঢাকা
১৯-০২-২২
addakhil791@gmail.com
fb.com/addakhil791

অনুবাদকের কথা

গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড!?

শব্দটা শোনার পর আমার প্রথম এক্সপ্রেশন ছিল—ভ্রূকুঞ্চন। অতঃপর কিছুটা তাচ্ছিল্যভাব। কিন্তু লেখকের বায়োগ্রাফি দেখে সমীহ্ তাচ্ছিল্যের জায়গা দখল করে নিতে সময় লাগেনি।

জেমস রিকার্ডস নিউইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলার রাইটার। মার্কিন আইনজীবী, ভাষ্যকার, ইনভেস্টমেন্ট বিশেষজ্ঞ। তিন দশকের বেশি সময় ধরে প্রত্যক্ষভাবে বিনিয়োগ, বিনিয়োগ পরামর্শ এবং বড় বড় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতালব্ধ। মার্কিন সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণী বৈঠকের অন্যতম 'অতিথি'।

ফলে পড়তে শুরু করেছি, এবং শেষ করতে করতে সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাজগতের সাথে পরিচিত হয়েছি।

অর্থনীতি ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা অঙ্গাঙ্গি জড়িত। বিগত শতকে তিনবার বিশ্ব অর্থব্যবস্থা ধসের মুখে পড়েছে। দুইবার তা বিশ্বযুদ্ধে গড়িয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর অর্থনীতি দেশগুলোর দ্বিতীয় সারির এজেন্ডা থেকে প্রথম সারিতে উঠে এসেছে। স্নায়ুযুদ্ধকালে সব দেশের মনোযোগের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু ছিল—নিরাপত্তা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা। কিন্তু কোল্ড ওয়ার সমাপ্ত হওয়ার পর অর্থনীতিই হয়ে ওঠে দেশগুলোর মুখ্য চিন্তা। বিশেষত, অর্থনীতিকে হাতিয়ার বানিয়ে চীনের বিস্ময়কর উত্থানের পর 'ইকোনোমি' শুধু উন্নয়নে সীমাবদ্ধ নেই; বরং 'ইকোনোমিক উইপন'-এ পরিণত হয়েছে।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই অর্থনীতি, বিশ্বনিরাপত্তায় অর্থনীতির ভূমিকা এবং অর্থব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো আলোচনায় আসার কথা, কিন্তু আসছে না। কেন? বইয়ের শেষ নাগাদ আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন।

বক্ষ্যমাণ বইটি গড়পড়তা অনুবাদ নয়। স্বাধীন অনুবাদ। জেমস রিকার্ডসের 'দ্য নিউ কেস ফর গোল্ড'-এর ছায়া অনুবাদ বলা চলে।

মৌলিকভাবে লেখকের কাঠামো অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। সংযোজিত তথ্যের উৎস উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচনার সূত্র মেলাতে প্রথম অধ্যায়টি সংযুক্ত করা হয়েছে। যথারীতি তথ্য-উপাত্তের রেফারেন্স রয়েছে।

আশা করি বইটি আপনার চিন্তাজগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে, ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে। এবং অবশ্যই প্রথাগত চিন্তার ভিত কাঁপিয়ে দেবে। ছোট্ট কলেবরের বইটি এক বৈঠকে পাঠ ছেড়ে ওঠা দুষ্কর।

বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে এটিই প্রথম অ্যাকাডেমিক কাজ।

ভুলত্রুটি মার্জনীয়। অবগত করলে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সংশোধন করে নেব।

দোয়ার মুখাপেক্ষী

রাকিবুল হাসান

তাকমিল, মাদরাসা বাইতুল উলুম ঢালকানগর
ইফতা, জামিয়াতু মাআরিফ আল ইসলামিয়া, ঢাকা
শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
rakibulhasanduir@gmail.com
০১-২৯-২০২২

প্রথম অধ্যায়

এক চুমুকে মুদ্রার ইতিহাস

বিনিময় প্রথা

ধারণা করা হয় আদিম-সমাজে মুদ্রার প্রচলন ছিল না; বরং বলা ভালো প্রয়োজন ছিল না। সবাই যার যার নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেই উৎপাদন করত। কারও সাথে কোনো কিছু বিনিময়ের প্রয়োজন ছিল না, ফলে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার প্রয়োজনও ছিল না। ধীরে ধীরে সমাজ বড় হয়েছে, উন্নত হয়েছে, কর্মবিভাজন হয়েছে। কর্মবিভাজন ও শ্রেণিবিন্যাসের ফলে নিজের প্রয়োজনীয় সবকিছু উৎপাদন সবার পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাখালের পক্ষে কৃষিকাজ সম্ভব না, যেমন সম্ভব না কৃষকের পক্ষে মৃৎপাত্র নির্মাণ।

প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে ওঠে barter বা বিনিময় প্রথা। পণ্যের বিনিময়ে পণ্য আদানপ্রদান। কৃষকের চাল দরকার, হয়তো দুধ দিয়ে চাল নিচ্ছেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখন, যখন চাল বিক্রেতার দুধ প্রয়োজন নেই। সবক্ষেত্রেই এমন সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। ফলে মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যদ্বারা সব ক্রেতা-বিক্রেতা লেনদেন করতে পারবে। এ থেকে গড়ে ওঠে পৃথিবীর প্রাচীনতম মুদ্রাব্যবস্থা। অঞ্চলভেদে মুদ্রাব্যবস্থায় ভিন্নতা ছিল।

সাধারণত মুদ্রার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় লক্ষ রাখতে হতো। আকার, মূল্য ও গুণাগুণের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য বস্তুগুলো মুদ্রা হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

কড়ি

টাকাকড়ি, বা কপর্দকশূন্য শব্দগুলো বাংলায় হরহামেশা ব্যবহৃত হয়। টাকার বিষয়টা না হয় বুঝা গেল, কিন্তু কড়ি? কড়ি হচ্ছে প্রাচীনতম মুদ্রা। শামুক-ঝিনুকের খোলস। ১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এর প্রচলন শুরু হয়। বিশেষত সমুদ্রোপকূলের সভ্যতাগুলোতে। কড়ি ব্যবহারের বেশ কিছু সুবিধা ছিল। এগুলো প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন, আকার ও গুণাগুণের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাশাপাশি দীর্ঘদিন সংরক্ষণযোগ্য। অর্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সংরক্ষণযোগ্যতা। টাকা রেখে

দিলেন, কয়েক বছর পর যদি দেখেন আলুর মতো সব পচে গেছে, অনুভূতিটা নিশ্চয় সুখকর হবে না। শামুক-ঝিনুক সমুদ্রোপকূলে সহজলভ্য ছিল বিধায় দক্ষিণ এশিয়া এবং আফ্রিকায় এর ব্যাপক প্রচলন ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপেও কড়ির ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছিল। ফিজিসহ বেশ কিছু দ্বীপে তিমির দাঁত মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

ভারতবর্ষে এবং বাংলায় প্রাচীন ও মধ্যযুগে কড়ি ব্যবহৃত হতো। সংস্কৃতে কড়িকে বলা হয় কপর্দক। বড় বড় শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোতে স্বর্ণ-রুপার মুদ্রা প্রচলিত থাকলেও এগুলোর ব্যবহার সেখানেই সীমিত ছিল। গ্রামাঞ্চলে কড়িই ছিল লেনদেনের মাধ্যম। ফলে মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক এবং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রকরা কর আদায়ের মানদণ্ড হিসেবে কড়িকেই বেছে নিয়েছিলেন। আকবরের উপদেষ্টা আবুল ফজলের রচনাবলিতেও কড়িকে বাজারমূল্যের মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

পয়সা

পৃথিবীর সব সভ্যতায়—গ্রামে এবং বাণিজ্যকেন্দ্রে—কড়ি বা এই জাতীয় প্রাকৃতিক মুদ্রা ব্যবহৃত হতো না। যখন প্রাকৃতিক মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তখন বা তারও পূর্ব থেকে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ধাতব মুদ্রার প্রচলনও ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে প্রথম পয়সার ব্যবহার শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ২০০০ সালে, ব্যবিলনে। কিন্তু সরকারি মুদ্রা বা কয়েনের সূচনা হয় খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে। লিডিয়া রাজ্যে, যা বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত, খ্রিষ্টপূর্ব ৬১০ সালের দিকে সরকারি কয়েনের প্রচলন শুরু হয়। যা ছিল লিডিয়ার রাজা ক্রোয়েসাস কর্তৃক প্রবর্তিত। ধীরে ধীরে আশেপাশের রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। কয়েনগুলোতে রাষ্ট্রীয় নানা প্রতীক অঙ্কিত থাকত। লিডিয়ার প্রাথমিক মুদ্রাগুলো স্বর্ণ-রুপার সংমিশ্রণে তৈরি হতো। পরবর্তী সময়ে স্বর্ণ ও রুপার আলাদা আলাদা কয়েন চালু করা হয়।

কাগুজে অর্থ

চিনে কাগজের আবিষ্কার হয়েছিল। ফলে ধারণা করা হয় কাগুজে টাকার ব্যবহারও সম্ভবত চীন থেকেই শুরু হয়। কাগুজে টাকার পূর্বে এবং সামসময়িককালে চামড়ার টাকাও ব্যবহৃত হতো। বিশেষত রোম সাম্রাজ্য এবং রাশিয়া-সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চামড়ার টাকার প্রমাণ মেলে। কাগুজে টাকা হচ্ছে প্রথম প্রমিসারি মানি বা ফিয়াট কারেন্সি। ৯৯৭ থেকে ১০২২ সাল নাগাদ কাগুজে টাকার উদ্ভব হয় এবং আঠারো ও উনিশ শতকে বিশ্বব্যাপী কাগুজে টাকার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়।

---

[১] বাংলাপিডিয়া, https://fliplink.io/Fz৫8K

শুরুর দিকে কাগুজে টাকা মূলত স্বর্ণ-রুপার প্রতিনিধি ছিল। অর্থাৎ যাদের নিকট অনেক স্বর্ণ-রুপা বা দিনার-দিরহাম ছিল, যেহেতু এগুলো বহন করা কাগজের তুলনায় কিছুটা শ্রমসাধ্য, পাশাপাশি ছিল নিরাপত্তার প্রশ্ন, তাই বাজারের বৃহৎ কোনো স্বর্ণকার বা ব্যবসায়ীর নিকট স্বর্ণ-রুপা গচ্ছিত রাখত। বিনিময়ে তারা একটা কাগজে লেখে দিত যে আমার নিকট এই কাগজ বহনকারীর এত পরিমাণ স্বর্ণ রক্ষিত আছে। এই সার্টিফিকেট বহনকারী কেনাবেচার সময় দোকানে গিয়ে স্বর্ণ এনে দেওয়ার পরিবর্তে এই কাগজ দিয়ে দিত, যদি প্রয়োজন হয় কাগজ দেখিয়ে স্বর্ণ তুলে নিতে পারবে। বর্তমান সময়ের টাকার গায়ে লেখা থাকে—চাহিবামাত্র ইহার বাহককে ১০ টাকা দিতে বাধ্য থাকবে, এর অর্থ হচ্ছে এই কাগজ বহনকারীকে সেই স্বর্ণকার বা ব্যবসায়ী ১০ টাকা সমপরিমাণ স্বর্ণ-রুপা দিতে বাধ্য থাকবে।

এটা সে সময়ের কথা। বর্তমানে এই টাকার পেছনে কোথাও কোনো স্বর্ণ রক্ষিত নেই। ফলে লেখাটা জাস্ট ফ্যাশন। এভাবে দেখা গেল স্বর্ণকারদের হাতে প্রচুর স্বর্ণ জমা হচ্ছে, মানুষ কাগজেই লেনদেন করছে, বাস্তব স্বর্ণ তুলতে আসছে খুবই কম। তখন তারা আরও বেশি বেশি কাগজ ছাড়তে শুরু করল। এক ভরি স্বর্ণের বিপরীতে হয়তো দেড় ভরির কাগজ ছেড়েছে। কারণ, দেড় ভরি স্বর্ণ কেউ একসঙ্গে তুলতে আসবে না।

অন্যদিকে স্বর্ণকাররা আবার এসব স্বর্ণ বড় বড় ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ দিতে শুরু করে। এভাবেই আধুনিক ব্যাংকিংব্যবস্থার পূর্বসূরির জন্ম হয়। পরবর্তী সময়ে সরকার আইন করে স্বর্ণ গচ্ছিত রাখা এবং এর বিপরীতে কাগজ ছাপার অনুমতি শুধু ব্যাংকগুলোতে সীমাবদ্ধ করে দেয়, আরও পরে এই ক্ষমতা শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

যেহেতু কাগজগুলো প্রকৃত 'অর্থ' নয়; বরং অর্থের প্রতিনিধিমাত্র, তাই এগুলোকে বলা হতো প্রমিসারি মানি বা অঙ্গীকারাবদ্ধ অর্থ। অর্থাৎ এই কাগজ জমা দিলে তাকে সমপরিমাণ 'প্রকৃত অর্থ' (স্বর্ণ-রুপা) দিতে হবে। যখন থেকে কাগুজে অর্থের বিপরীতে স্বর্ণ-রুপা সংরক্ষিত রাখার বিধান বাতিল হয়ে যায়, তখন থেকে কাগজ শুধুই ফিয়াট কারেন্সি বা বিহিত মুদ্রা। বিহিত মুদ্রা বলা হয় যা নির্দিষ্ট দেশের সরকারের আদেশবলে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : টাকা, রুপি, ডলার ইত্যাদি।

গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড

কাগুজে টাকার প্রচলন শুরু হওয়ার পর দেখা গেল সরকারগুলো যথেচ্ছ টাকা ছাপছে। এখনো ছাপে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তৎকালীন সুপার পাওয়ার যুক্তরাজ্য ১৮২১ সালে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ঘোষণা করে। তবে ব্রিটেন নিজস্বভাবে ১৭১৭ সাল থেকেই গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলত।[১] ১৮২১ সালে অন্যদের জন্যও এই ব্যবস্থা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তারপর থেকে টাকা ছাপানোর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা স্বর্ণের মজুত থাকতে হতো। কী পরিমাণ স্বর্ণের বিপরীতে কী পরিমাণ টাকা ছাপা যাবে তা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। অবশেষে ১৯৭১ সালে এই পদ্ধতি বাতিল হয়ে যায়। ফলে ১৯৭১ সালের পর থেকে টাকা শুধুই টাকা, এর বিপরীতে কিছুই নেই। জাস্ট এক টুকরো কাগজ। কাগুজে টাকার পর আসে ক্রেডিট কার্ড। এখন ডিজিটাল মুদ্রা বিটকয়েনও জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।[২]

টার্নিং পয়েন্টস : জিনোয়া কনফারেন্স

অর্থব্যবস্থার ইতিহাসে কিছু ঘটনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এর মাঝে রয়েছে ১৯২২ সালের জিনোয়া কনফারেন্স। জিনোয়া ইতালির একটি শহর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড চলমান ছিল। যুদ্ধব্যয় বহন করতে গিয়ে ইউরোপের অনেক দেশ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ত্যাগ করে। যুদ্ধে ইউরোপের প্রাণহানি এবং সম্পদহানীর পরিমাণও ছিল অকল্পনীয়। পাশাপাশি যুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপে দুটি ‘বিচ্ছিন্ন’ দেশ ছিল—জার্মানি এবং রাশিয়া। জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাজিত শক্তি এবং কালপ্রিট একঘরে ছিল। আর রাশিয়াতে ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের ফলে ইউরোপের অন্যান্য অংশ থেকে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এসব ইস্যু সমাধান করার জন্য ১৯২২ সালে ইতালির জিনোয়াতে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ইউরোপের ৩০টিরও অধিক দেশ এতে অংশগ্রহণ করে। কনফারেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড পুনর্বহাল করা এবং রাশিয়ার সাথে ইউরোপের লেনদেননীতির সুরাহা করা।

কনফারেন্স থেকে নতুন ‘গোল্ড এক্সচেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড’ ঘোষিত হয়। যুদ্ধপূর্ব ‘গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড’ থেকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ‘গোল্ড এক্সচেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড’ ছিল ভিন্নতর। সবচেয়ে বড় পার্থক্য ছিল—পূর্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো শুধু স্বর্ণ-রুপা মজুত করত। এখন থেকে তারা সুনির্দিষ্ট কিছু বিদেশি কারেন্সিও (রাষ্ট্রীয় মুদ্রা) মজুত করবে।

[১] James Rickards, *Currency wars : the making of the next global crisis,* New Yourk, Penguin, 2011, p. 51

[২] এই অংশের বাকি সমস্ত তথ্য এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা থেকে সংগৃহীত, https://fliplink.io/pr5h8

চাইলে এই মজুদের ‘বিনিময়ে’ সেই দেশ থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করতে পারবে। এজন্যই এর নামে ‘এক্সচেঞ্জ’ অংশটুকু যুক্ত হয়েছে। স্বর্ণের রেট আউন্সপ্রতি ২০.৬৭ ডলারে ধরে রাখার দায়িত্ব পড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাড়ে। অন্যান্য দেশ চাইলে স্বর্ণের পাশাপাশি ডলারও মজুত করতে পারে।

দ্বিতীয় পরিবর্তন ছিল—দেশগুলো এখন অল্পস্বল্প স্বর্ণ এক্সচেঞ্জ করতে পারবে না। ডলার বা অন্য কারেন্সি দিয়ে স্বর্ণ বিনিময় করতে চাইলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ করতে হবে—সর্বনিম্ন চারশ আউন্সের বার। তৎকালীন বাজারমূল্য ৮২৪৮ ডলার, বর্তমান বাজারমূল্যে যা প্রায় ১ লাখ ১০ হাজার ডলার। ফলে দেখা গেল কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বড় বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানই শুধু এক্সচেঞ্জ করতে পারছে।

গোল্ড এক্সচেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ডে কাগুজে অর্থ স্বর্ণের বিকল্প হয়ে ওঠে। আর স্বর্ণের ঠাঁই হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে। এভাবে মানুষের হাত থেকে স্বর্ণ খসে যায়। এই নীতি বহাল রেখে ব্রিটেন ১৯২৫ সালে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড এ্যাক্ট জারি করে।[১] প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থব্যবস্থাকে আমরা জিনোয়া সিস্টেম নামে অভিহিত করতে পারি।

ব্রেটন উডস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও ইউরোপের ত্রাহি ত্রাহি দশা হয়েছিল। বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা ছিল আরও ভয়াবহ। কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয়দের বিধ্বংসী ক্ষমতা বহুগুণ বেড়েছে। সেসব নিয়ে জান্তব জিঘাংসায় খুনের নেশায় মেতে উঠেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। তন্মধ্যে ইউরোপীয়দের সংখ্যা ছিল ২ কোটি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বিগুণেরও বেশি।

যুদ্ধোত্তর ইউরোপ আক্ষরিক অর্থেই ছিল ইট-সুড়কির ভাগাড়। বার্লিন, প্যারিস-সহ অভিজাত সব শহর তখন ভূতুড়ে নগরী। রাস্তাঘাট নেই, শহর নেই, গ্রামও নেই। ৬ কোটি ইউরোপীয় ভিটেমাটি হারিয়েছে। দেশ ছেড়েছে আড়াই কোটির অধিক। ১৯৪৫ সালে এক সপ্তাহে শুধু জার্মানির একটি ক্যাম্পেই শরণার্থী এসেছিল ৪০ হাজার![২]

দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইউরোপীয় দখলদাররা এশিয়া—আফ্রিকা-সহ গোটা বিশ্বকেই উপনিবেশ বানিয়ে ফেলেছিল। দখলদারত্বের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌশক্তি। দখলাভিযান থেকে শুরু করে দাস-ব্যবসা কিংবা সম্পদ লুণ্ঠন সবকিছুই

[১] James Rickards, *Currency wars : the making of the next global crisis,* New Yourk, Penguin, 2011, p. 70

[২] এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা, https://fliplink.io/yw8tI

হত নৌরুটে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান—আমেরিকা, জার্মানি—ইংল্যান্ডের ভয়াবহ নৌযুদ্ধের ফলে যুদ্ধের পর ইউরোপীয়দের নৌবহর বলতে তেমন কিছু অবশিষ্ট থাকেনি। ফলে তাদের লুণ্ঠন-সামর্থ্য তীব্রভাবে হ্রাস পায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের মুখ থুবড়ে পড়ে। এমনকি উপনিবেশগুলো ধরে রাখতে যে পরিমাণ সেনা-অর্থ প্রয়োজন, তাও ছিল না। ফলে উপমহাদেশ-সহ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্নিবার হয়ে ওঠে।

তবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একটি দেশ সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে—আমেরিকা। অর্থনৈতিক, সামরিক, প্রযুক্তি-সহ সর্বক্ষেত্রে আমেরিকা তখন সর্বেসর্বা। ইউরোপ মার্কিন ঋণের ভারে জর্জরিত। তাদের নৌবহর উধাও। কিন্তু প্রশান্ত আর আটলান্টিক মহাসাগরের বুক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মার্কিন নৌবহর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিনীদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—ইউরোপীয়দের যুদ্ধে আমাদের জড়ানো উচিত হয়নি। ফলে তারা আইসোলেশনিজম বা নিঃসঙ্গতাবাদে ফিরে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তারা সে পথে হাঁটেনি। বরং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ হটিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ঘটে। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যদি আমেরিকা ইউরোপের পুনর্গঠনে হাত না দিত, আজকের ইউরোপ হয়তো আফ্রিকার চেয়ে ভিন্নতর হতো না।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থব্যবস্থা নির্ধারণকল্পে ১৯৪৪ সালের জুলাইতে আমেরিকা একটি সম্মেলন ডাকে। এই ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধরত ৪৪টি দেশের প্রতিনিধিরা যুক্তরাষ্ট্রের নিউহ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসে সম্মিলিত হয়। যুদ্ধ-পরবর্তী অর্থব্যবস্থা এখান থেকে গড়ে উঠেছে বিধায় একে বলা হয় ব্রেটন উডস সিস্টেম।

এর মূল বিষয়গুলো ছিল স্বর্ণকে মানদণ্ড ধরে একটি নতুন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড গড়ে তোলা। তবে এর এক্সচেঞ্জ রেট ছিল ফিক্সড। ডলারের বিপরীতে স্বর্ণ ছিল। অন্যসব দেশের মুদ্রা ছিল ডলারনির্ভর। অর্থাৎ ডলার-বেজড গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড। সব দেশের মুদ্রার বিপরীতে আছে ডলার, ডলারের বিপরীতে আছে স্বর্ণ, ফলে পরোক্ষভাবে সব দেশের মুদ্রাই স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত। যদি অন্য দেশ তাদের হাতে থাকা ডলার ভাঙিয়ে স্বর্ণ সংগ্রহ করতে চায়, আমেরিকা দিতে বাধ্য থাকবে। এভাবে ডলার হয়ে ওঠে গ্লোবাল রিজার্ভ কারেন্সি। বিশ্বমুদ্রা।

বিশ্ব অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্রেটন উডস থেকে দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। এগুলোকে বলা হয় ব্রেটন উডস ইন্সটিটিউটস। প্রথমটি বিশ্বব্যাংক, এর অফিশিয়াল নাম—International Bank for Reconstruction and Development। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আইএমএফ (International Monetary Fund)। বর্তমানে আরও পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক

গ্রুপ। ব্যাংকের নাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূলত বিধ্বস্ত ইউরোপ পুনর্গঠনে ঋণ সহায়তা প্রদান করার জন্য।[১]

আর আইএমএফের প্রধান দায়িত্ব ছিল আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। কারেন্সি বিনিময়ের হার স্থিতিশীল রাখা এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনে সহায়তা করা। যেহেতু ব্রেটন উডস অর্থব্যবস্থায় এক্সচেঞ্জ রেট ছিল ফিক্সড, তাই কোনো দেশ নিজ কারেন্সির দর কমবেশি করতে চাইলে আইএমএফের অনুমতি নিতে হতো। যেন ১৯২৯ সালের মতো অবস্থা পুনরায় তৈরি না হয়।[২]

তৃতীয় আরেকটি চুক্তি হয়েছিল ব্রেটন উডসে—জেনারেল অ্যাগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস অ্যান্ড ট্রেড (GATT)। এর উদ্দেশ্য ছিল মুক্ত বাণিজ্য ও মুক্ত বাজার নিশ্চিত করা। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর অর্থব্যবস্থাকে বলা হয় ব্রেডন উডস অর্থব্যবস্থা। বর্তমানে যদিও এর গুরুত্বপূর্ণ বহু অংশ খসে গেছে, কিন্তু ব্রেটন উডস ইন্সটিটিউটগুলো বিশ্ব—অর্থব্যবস্থায় এখনো প্রভাবশালী ও প্রাসঙ্গিক।

পেট্রোডলার

১৯৭১ সালে ব্রেটন উডস ভেঙে পড়ে। এই ব্যবস্থার অধীনে যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল যে ডলারের বিপরীতে চাইলে স্বর্ণ সংগ্রহ করা যাবে। ফলে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ আমেরিকার হাতছাড়া হয়ে যায়। ইউরোপীয় অনেক দেশ, বিশেষত ফ্রান্স দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে খোয়া যাওয়া স্বর্ণ পুনরুদ্ধারকল্পে ডলার ভাঙিয়ে স্বর্ণ নিয়ে নিচ্ছিল। বাধ্য হয়ে ১৯৭১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ডলারকে স্বর্ণে কনভার্ট করার সুযোগ বন্ধ করে দেন। ফলে পরোক্ষ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডভিত্তিক ব্রেটন উডস অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। তারপর থেকে বিশ্ব-অর্থব্যবস্থা 'ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট'-ভিত্তিক।

বর্তমানে সব কাগুজে মুদ্রা। এর পেছনে কোনো সম্পদ নেই, কোথাও নেই। কারেন্সিগুলো টিকে আছে শুধু মানুষের আস্থার ভিত্তিতে। কোনো কারণে কাগজের এই টুকরোগুলোর ওপর মানুষের আস্থা চলে গেলে—অর্থব্যবস্থা ধসে পড়বে।

নিক্সনের ঘোষণায় গোটা পৃথিবী হতভম্ব হয়ে যায়। তাদের মর্মবেদনা এতই সুগভীর ছিল যে, এই ঘোষণাকে 'নিক্সন শক' নামে অভিহিত করা হয়। ১৯৭১ সালের পর থেকে বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় ডলারের কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল না। পাশাপাশি নিক্সন শকের পর থেকে ডলারের দরপতন চলতেই থাকে। এ সময় মার্কিন প্রেসিডেন্টরা

---

[১] https://www.worldbank.org/en/who-we-are

[২] HYPERLINK "https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance

সৌদি আরবের সাথে আলোচনা শুরু করেন যেন সৌদি শুধু ডলারেই তেল বিক্রি করে। সৌদি-আমেরিকার 'তৈলাক্ত' সম্পর্কের সূচনা যদিও ১৯৪৫ সালে।[১] ১৯৭৪ সালে এটি গতি পায়। এ ক্ষেত্রে ১৯৭৩ সালের আরব-ইজরাইল যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আরব-ইজরাইল যুদ্ধে আমেরিকা ইজরাইলীয়দের পক্ষাবলম্বন করার ফলে ওপেক, যা তখন আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রভাবাধীন ছিল, পশ্চিমাদের নিকট তেল রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। হুহু করে তেলের দাম বাড়তে শুরু করে। একে তো ডলারের নিম্নগতি, তার ওপর তেলের ঊর্ধগতিতে মার্কিনীদের বেশ নাজেহাল অবস্থা। সৌদির সাথে একাধিক চুক্তি—গোপনচুক্তির পর স্থির হয় যে, সৌদি আরব ডলার ছাড়া তেল বিক্রি করবে না। ফলে ওপেকের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রও ডলারে তেল বিক্রি করতে শুরু করে। জন্ম হয় পেট্রোডলারের।

এরপর থেকে বিশ্বের যেকোনো দেশ তেল ক্রয় করতে চাইলে ডলারে ক্রয় করতে হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য নির্ধারিত হয় ডলারে। এভাবে ব্রেটন উডসের ফিক্সড গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ভেঙে পড়ার পরও বৈশ্বিক রিজার্ভ কারেন্সি ডলার টিকে যায়। গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড আর পেট্রোডলারের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। অনেকে মনে করেন এখন বুঝি ডলারের বিপরীতে তেল আছে। আসলে তা নয়।

বরং পেট্রোডলার এবং ডলার—দুটি আলাদা মুদ্রা; যদিও বাস্তবে দুটিই মার্কিন ডলার। তো পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হচ্ছে তেলবিক্রির মূল্যবাবদ বিক্রেতা রাষ্ট্র যে ডলার সংগ্রহ করে তা পেট্রোডলার, বাকিসব ডলার শুধুই ডলার। পেট্রোডলার নয়। পেট্রোডলারের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র নিছক বিশ্ববাজারে টিকে গেছে তাই নয়; বরং অন্যান্য দিক থেকেও প্রভূত লাভবান হয়েছে। পেট্রোডলারের ফলে তেল বিক্রেতা দেশগুলোর হাতে প্রচুর পরিমাণ ডলার পুঞ্জিভূত হয়ে যায়। এগুলো পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রেই বিনিয়োগ করা হয় কিংবা নিজ রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মার্কিন প্রতিষ্ঠান দ্বারা করিয়ে বেতন ডলার পরিশোধ করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় পেট্রোডলার রিসাইকল। রিসাইক্লিং এর ফলে একদিকে আমেরিকায় বিশাল-বিপুল বিনিয়োগ এসেছে, অপরদিকে তাদের শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে।

বর্তমানে পেট্রোডলারের অস্তিত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। রাশিয়া, চীনের মতো বড় বড় তেল উৎপাদনকারী দেশ ওপেকের সদস্য নয়। তারা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। রাশিয়া, চীন, ভারত-সহ অনেক দেশ নিজস্ব মুদ্রায় তেল বিক্রির চেষ্টা করছে।[২]

---

[১] https://fliplink.io/kc4Na

[২] https://www.investopedia.com/terms/p/petrodollars.asp

চীন তো পেট্রোইয়ান (ইয়ান চীনের মুদ্রা) প্রচলনের চেষ্টাও করছে। এর কারণ হচ্ছে ডলারের মূল্য নানা কারণে উঠানামা করে। সাম্প্রতিক সময়ে এই উত্থানপতন তীব্রতর হচ্ছে। ফলে যেসব দেশের হাতে বিপুল পরিমাণ পেট্রোডলার থাকে, ডলারের মূল্য কমলে তাদের পেট্রোডলারের মূল্যও কমে যায়। সম্পদহানি হয়। তাই অনেক দেশ পেট্রোডলারের বিকল্প সন্ধানে ব্যস্ত। পেট্রোডলারের পতনের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দাদাগিরির 'শুভসমাপ্তি' নিশ্চিত হবে।

* * *

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ শতক : মুদ্রাস্ত্র ও মুদ্রাযুদ্ধের ইতিবৃত্ত

‘আমরা একটি বৈশ্বিক কারেন্সি ওয়ারের মাঝে আছি।’

—গুইডো ম্যানতেগা, ব্রাজিলের অর্থমন্ত্রী

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১০

মুদ্রাযুদ্ধ বলতে বোঝানো হয় কোনো দেশের নিজস্ব মুদ্রার মূল্যহ্রাসকরণ (ডিভ্যালুয়েশন)। মুদ্রাযুদ্ধ যদিও বৈশ্বিক, কিন্তু এর উৎস দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি। যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির চারটি উপাদান রয়েছে। ভোগ, বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয় এবং রপ্তানি। প্রথম তিনটি দেশের অভ্যন্তরস্থ, চতুর্থটি বহির্বিশ্বের সাথে সম্পৃক্ত। সাধারণত দেশের অর্থনীতিতে মন্দাভাব দেখা দিলে সরকার এমন সব পলিসি গ্রহণ করে যেন মানুষ বেশি বেশি কনজাম্পশন বা ভোগ করতে শুরু করে। কারণ বেশি ভোগ মানে বেশি বিক্রি, বেশি উৎপাদন, বেশি কর্মসংস্থান এবং বেতন ও প্রফিটবাবদ মানুষের হাতে বেশি পরিমাণ অর্থ। এটি একটি চক্রের ন্যায়। কখনো প্রাইভেট সেক্টর বিনিয়োগ করতে ব্যর্থ হলে সরকার নিজেই বিনিয়োগ করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে। বেতন-ভাতাবাবদ মানুষের হাতে অধিক টাকা এলে ভোগের পরিমাণও বাড়বে। প্রবৃদ্ধিচক্র শুরু হবে।

কিন্তু যখন প্রথম তিনটির কোনোটিই কাজে আসে না, তখন একমাত্র উপায় রপ্তানিবৃদ্ধি। রপ্তানিবৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে দেশের মুদ্রার মান কমিয়ে দেওয়া বা ডিফ্ল্যাশন ঘটানো। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ক্লিয়ার করা যাক। মনে করি, ১০ ডলার মূল্যে বাংলাদেশের কোনো এক গার্মেন্টস আমেরিকাতে টিশার্ট রপ্তানি করে। প্রতিডলারের দাম বাংলাদেশি টাকায় ৮০ টাকা। ফলে ১০ ডলার সমান ৮০০ টাকা।

যদি সহসাই টাকার মূল্য কমে যায়?

টাকার মূল্য হ্রাসের অর্থ হচ্ছে টাকার বিপরীতে ডলারের মূল্যবৃদ্ধি। ফলে আগে এক ডলার ছিল ৮০ টাকা, এখন ডলারের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ১ ডলার ৯০ টাকা। বাংলাদেশি গার্মেন্টস মালিক আগে ১০ ডলার ভাঙিয়ে ৮০০ টাকা পেত, কিন্তু

এখন প্রতিটি ডলার ভাঙিয়ে সে পাবে ৯০ টাকা। ফলে ৮০০ টাকার জন্য তার দরকার ৮.৮ ডলার।

ফলে ইতিপূর্বে মার্কিন ক্রেতা যে টিশার্টটা ১০ ডলারে ক্রয় করত, এখন সে তা ৮.৮ ডলারে ক্রয় করতে পারবে। এদিকে বাংলাদেশি গার্মেন্টস মালিকের কিন্তু ক্ষতি নেই। সে পূর্বে ১০ ডলার ভাঙিয়ে ৮০০ টাকা পেত, এখন ৮.৮ ডলার ভাঙিয়ে ৮০০ টাকাই পাবে। এভাবে মুদ্রার মান হ্রাস পেলে (ডিফ্ল্যাশন) রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। কারণ যে দেশের মুদ্রার মান হ্রাস পায়, সে দেশের পণ্যের দাম কমে। চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

কোনো দেশ যখন মুদ্রার মান হ্রাস করে, প্রতিযোগী দেশের তুলনায় এর রপ্তানি বেড়ে যায়। একে বলা হয় beggar thy neighbor বা প্রতিবেশীর বারোটা বাজিয়ে নিজের বাজিমাত। এ ক্ষেত্রে সেই প্রতিবেশী কি বসে থাকবে? না, সেও তার মুদ্রার মান কমাবে। চক্রাকারে চলতেই থাকবে। ফলফল? মুদ্রাযুদ্ধ।

রপ্তানিবৃদ্ধির পাশাপাশি ডিফ্ল্যাশনের অন্যান্য ভালো দিকও রয়েছে। এটি পর্যটক আকর্ষণ করে। কারণ পূর্বে যদি একজন মার্কিন পর্যটকের ব্যয় হতো ১০ ডলার, এখন সে ৮.৮ ডলার ব্যয়ে তা করতে পারবে। কিন্তু মুদ্রাহ্রাসের ভিন্নপিঠও রয়েছে। রপ্তানির ক্ষেত্রে যেমন এটি সুবিধা দেয়, তেমনই আমদানির ক্ষেত্রে অসুবিধা তৈরি করে।

যেমন উপর্যুক্ত উদাহরণে যদি বাংলাদেশ আমেরিকা থেকে টিশার্টের সুতো কিনে। তাহলে আগে ১০ ডলারের সুতো কেনার জন্য বাংলাদেশি ক্রেতার খরচ হতো ৮০০ টাকা। এখন ডলারের দাম ৯০ টাকা হয়ে যাওয়ার ফলে ১০ ডলার বা ১০ ডলারের পণ্য কিনতে তার ব্যয় হবে ৯০০ টাকা। ১০০ টাকা বেশি। ফলে যদি এমন হয়—বাংলাদেশ যে টিশার্ট রপ্তানি করছে, তার সুতো আনতে হয় ভারত থেকে, রং আনতে হয় চীন থেকে, মেশিনারিজ আনতে হয় ইউরোপ থেকে, তাহলে টিশার্টের মূল্য যতটুকু কমার কথা, এসব আমদানি করতে গিয়ে তার চেয়ে বেশি খরচ হয়ে যেতে পারে, বা সমান সমান।

যদি কোনো দেশ মুদ্রার মূল্যহ্রাস করে, সে দেশের পণ্যের দাম কমবে, রপ্তানি বাড়বে। কিন্তু যদি আমদানিকারক দেশ আমদানি পণ্যের ওপর অধিক করারোপ করে; তবে যতটুকু মূল্য কমার কথা, তা কমবে না। এখন কথা হচ্ছে আমদানিকারক দেশ কেন অধিক করারোপ করবে? তার নিজস্ব পণ্যের বাজার ধরে রাখার জন্য। যদি আমদানিকৃত পণ্যের দাম স্থানীয় পণ্যের চেয়ে কম হয়, সে ক্ষেত্রে মানুষ বিদেশি পণ্য ব্যবহার করবে। নিজ দেশের দামি পণ্য প্রতিযোগিতায়

পিছিয়ে পড়বে। তাই কর আরোপ করে বিদেশি পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিতে পারে। একে বলা হয় প্রটেকশনিজম।

যখন দেশগুলোর মাঝে ডিভ্যালুয়েশন শুরু হয়, তখন প্রটেকশনিজমও বৃদ্ধি পায়। মুদ্রাযুদ্ধের অন্যতম দুই হাতিয়ার।

বিশ শতকে দুটি মুদ্রাযুদ্ধ হয়েছে। প্রথমটি ১৯২১ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত। শেষমেশ এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গড়িয়েছে। দ্বিতীয় মুদ্রাযুদ্ধের সময়কাল ধরা হয় ১৯৬৭ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত। এটি অবশ্য যুদ্ধে গড়ায়নি। ১৯৮৫ সালের প্লাজা এ্যাকর্ড এবং ১৯৮৭ সালে লুভর এ্যাকর্ডের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে। উভয় মুদ্রাযুদ্ধেরই কিছু কারণ ছিল। সেগুলো আলোচনা করব। তবে প্রথমে ক্লাসিক্যাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড কেমন ছিল, এর প্রভাবই-বা কী ছিল তা দেখতে চেষ্টা করব।

ক্লাসিক্যাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড (১৮৭০-১৯১৪)

গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বলতে বোঝানো হয় সরাসরি স্বর্ণের ব্যবহার কিংবা এমন কোনো মুদ্রার ব্যবহার যার বিপরীতে স্বর্ণ রয়েছে। মুদ্রা ও স্বর্ণের অনুপাতে তারতম্য হতে পারে। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে স্বর্ণের অনুপাত ২০ পার্সেন্ট থেকে ১০০ পার্সেন্ট পর্যন্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইংল্যান্ডে ১৭১৭ সালে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড চালু করা হয়। এক্সচেঞ্জ রেট ছিল ফিক্সড। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এটি টিকে ছিল। মাঝখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে কিছু সময়ের জন্য রহিত হয়েছিল। ১৮৭০-১৯১৪ পর্যন্ত সময়টুকুকে ক্লাসিক্যাল স্বর্ণমানের 'স্বর্ণযুগ' বিবেচনা করা হয়। এ সময় কোনোরূপ ইনফ্ল্যাশন (মুদ্রাস্ফীতি—মুদ্রার মান কমে যাওয়া) হয়নি। বরং প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে পুরো সময়জুড়ে পরিমিত ডিফ্ল্যাশন অব্যাহত ছিল। জীবনমান উন্নত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি এসেছে। মূলত এই সময়টুকুকে বলা হয় গ্লোবালাইজেশনের প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয়েছে ১৯৮৯ সালে, স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তিকালে। প্রথম ধাপে টেলিযোগাযোগ উদ্ভাবনের ফলে বিশ্ববাণিজ্যের কেন্দ্রগুলো পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যায়। দীর্ঘ ভ্রমণের ঝামেলা ছাড়াই বড় বড় বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

১৮৭০ সালের পূর্বেও বহু দেশে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড চালু ছিল। যেমন ইংল্যান্ড। অনুরূপ নেদারল্যান্ডেও ১৮১৮ সাল থেকে স্বর্ণমান চালু ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে ছিল ১৮৩২ থেকে। সেখানে ২০ ডলার সমমূল্যের একধরনের স্বর্ণের কয়েন প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৮৭০ ছিল মাইলফলক। এরপর বহু দেশ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ১৮৭১ সালে জার্মানি ও জাপান, ১৮৭৬ সালে ফ্রান্স, ১৮৭৯ সালে

অস্ট্রিয়া, ১৮৯৩ সালে রাশিয়া এবং ১৮৯৮ সালে ইন্ডিয়া-সহ বহু দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করে নেয়।

ক্লাসিক্যাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ছিল বেশ সহজ, জটিলতামুক্ত। গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক। কোনো দেশ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে নাম লেখাতে চাইলে যা করতে হতো—নিজ মুদ্রাকে সুনির্দিষ্ট একটি স্বর্ণহারের সাথে জুড়ে দিতে হবে, এবং অন্যান্য দেশের মুদ্রার সাথে এই হার অনুপাতে বিনিময় হবে। গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড সচল রাখতে এমনকি কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংকেরও দরকার হয়নি। ক্লাসিক্যাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের পুরো সময়টাজুড়ে আমেরিকাতে কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছিল না! তাদের ফেডারেল রিজার্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯১৩ সালে।

The Anatomy of International Monetary Regime বইতে তাত্ত্বিক ও ক্লাসিক্যাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড স্পেশালিস্ট Giulio M. Gallarotti সে সময়ের অর্থনৈতিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তার ভাষায়—

> 'Among that group of nations that eventually gravitated to gold standards in the latter third of the ১৯th century (i.e., the gold club), abnormal capital movements (i.e., hot money flows) were uncommon, competitive manipulation of exchange rates was rare, international trade showed record growth rates, balance—of—payments problems were few, capital mobility was high (as was mobility of factors and people), few nations that ever adopted gold standards ever suspended convertibility (and of those that did, the most important returned), exchange rates stayed within their respective gold points (i.e., were extremely stable), there were few policy conflicts among nations, speculation was stabilizing (i.e., investment behavior tended to bring currencies back to equilibrium after being displaced), adjustment was quick, liquidity was abundant,public and private confidence in the international monetary system remained high, nations experienced long—term price stability (predictability) at low levels of inflation,

long—term trends in industrial production and income growth were favorable and unemployment remained fairly low.'

অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে যেসব দেশ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে নাম লিখিয়েছে, তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক অর্থপ্রবাহ তেমন দেখা যেত না। মুদ্রামান কৃত্রিমভাবে প্রভাবিত করার অসুস্থ প্রতিযোগিতা ছিল দুর্লভ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রেকর্ড পরিমাণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ব্যালেন্স অব পেমেন্টের প্রব্লেম কদাচিৎ হতো। স্বাভাবিক অর্থপ্রবাহ বজায় ছিল। ফলে যেসব দেশ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ক্লাবে নাম লেখাত, তারা সাধারণত নাম আর প্রত্যাহার করত না, করলেও দ্রুতই ফিরে আসতে হতো। এক্সচেঞ্জ রেট সদস্য রাষ্ট্রগুলোর গোল্ড পয়েন্ট অনুযায়ী স্থিতিশীল ছিল। দেশগুলোর মধ্যে পলিসি নিয়ে সংঘাত বাধত না। অর্থব্যবস্থার ওপর মানুষের অগাধ আস্থা ছিল। দেশগুলো দীর্ঘমেয়াদি মূল্য—স্থিতিশীলতা উপভোগ করেছে, ইনফ্ল্যাশন রেট ছিল অত্যল্প। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্যিক উৎপাদনধারা অব্যাহত ছিল। ইতিবাচক আয়প্রবৃদ্ধি বজায় ছিল। বেকারত্ব ছিল নিম্নমুখী।

এই সবকিছুর মূলে ছিল—স্বর্ণ।

প্রথম মুদ্রাযুদ্ধ (১৯২১-১৯৩৬)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের একেবারে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা ছিল। যুদ্ধের শুরুতে ১৯১৪ সালে 'রুশ সাম্রাজ্য' অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের পর 'রুশ সাম্রাজ্য' বিলুপ্ত হয়ে যায়। বলশেভিকরা যুদ্ধ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার পাশাপাশি ব্রিটেন-ফ্রান্স থেকে যুদ্ধপরিচালনার জন্য সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। এদিকে ব্রিটেন-ফ্রান্স আবার আমেরিকার দেনার ভারে জর্জরিত ছিল। আমেরিকার নিকট ব্রিটেনের ঋণ ৪.৭ বিলিয়ন ডলার! তৎকালীন মাত্র সাড়ে চার বিলিয়ন! ওদিকে ফ্রান্স থেকে আমেরিকার পাওনা চার বিলিয়ন। আবার ফ্রান্স ব্রিটেন থেকে নিয়েছে তিন বিলিয়ন। মোট সাত বিলিয়ন। সাথে যুদ্ধের তাণ্ডব তো আছেই।

ফ্রান্স-জার্মানি-রাশিয়া; ইউরোপের তিন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। রাশিয়া নিজেকে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে নেয়। জার্মানি পরাজিত হয় এবং যুদ্ধের মূল কালপ্রিট হিসেবে অভিযুক্ত হয়। বাকি থাকে শুধু ফ্রান্স। ফ্রান্সের চোখ ছিল জার্মানির স্বর্ণের ওপর। জার্মানির স্বর্ণের মজুত ছিল ৮৭৬ মেট্রিক টন। যা তৎকালীন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মজুত। আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্সের পর জার্মানি।

জার্মানির যুদ্ধাপরাধের সাজা নির্ধারিত হয় ১৯১৯ সালে স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তিতে। তথাকথিত এই 'শান্তিচুক্তি' ২০ বছর ধরে গোটা ইউরোপকে অশান্ত করে রাখার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিয়ে ফেলে। শান্তিচুক্তির শান্তি এতই বেশি ছিল যে ইউরোপীয় লুটেরারাও এর ভার বইতে পারছিল না। তারা জানত আরেকটি যুদ্ধ অপরিহার্য। নিঃসন্দেহে। শুধু অপেক্ষা—কখন? দ্য সুনার, দ্য বেটার।

চুক্তিতে একদিকে জার্মানির অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র Saar Basin এবং Alsace—Lorraine-সহ অনেক এলাকা, বন্দর জার্মানির হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অপরদিকে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণের বোঝা। মাত্র ১৩২ বিলিয়ন গোল্ড মার্ক (জার্মান মুদ্রা)। স্বভাবতই হাত-পা কাটা দেশের পক্ষে এই বিপুল ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্ভব না। ফলে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম ১৯২৩ সালে জার্মানির খনি এলাকা Rurh উপত্যকা দখল করে নেয়। দুই বছর এটি তাদের দখলে ছিল।

এসব শোধ-প্রতিশোধের ঢামাঢোলের ভেতর শুরু হয় প্রথম মুদ্রাযুদ্ধ, ১৯২১ সালে। সে বছর জার্মানির কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাপক 'মুদ্রামুদ্রণ' শুরু করে। ফলে শুধু ইনফ্ল্যাশন নয়, হাইপার ইনফ্ল্যাশন দেখা দেয়। জার্মানদের যুক্তি ছিল সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সচল রাখতে এবং শ্রমিকদের বেতনভাতা পরিশোধ করতে মার্ক ছাপা হচ্ছে। অনেকের বিশ্বাস—মূলত ভার্সাই চুক্তিতে চাপিয়ে দেওয়া ক্ষতিপূরণের বোঝা নামাতেই জার্মানির এই মুদ্রাযুদ্ধ। এটি পুরোপুরি সত্য নয়।

মুদ্রামুদ্রণের ফলে ১৯২১ সালে প্রথমে হালকা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ১৯২২-এ এসে ধীরে ধীরে হাইপার ইনফ্ল্যাশনে বাঁক নিতে শুরু করে। কারণ ততদিনে রাইসব্যাংক (Reichsbank—জার্মানির কেন্দ্রীয় ব্যাংক) অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের আশা বাদ দিয়ে মুদ্রা ছাপায় মন দিয়েছে কেবল সরকারি চাকরিজীবী এবং শ্রমিক ইউনিয়নের চাহিদা মেটাতে। মার্কের বিপরীতে ডলারের মূল্য এত বেড়ে যায় যে, আমেরিকান পর্যটকরা ডলার ভাঙাতে পারত না। কারণ ব্যবসায়ীরা তখন এক ডলার সমান কত মার্ক তা-ই নির্ধারণ করতে পারত না। কেউ রেস্টুরেন্টে ডিনারে বসলে পূর্বেই মূল্য চুকিয়ে বসত, কারণ খাওয়া শেষ হতে হতে খাবারের মূল্য বেড়ে যাবে বহুগুণ!

সরকারি নোটের চাহিদা এত তীব্রতর ছিল যে মার্ক ছাপতে রাইসব্যাংক অসংখ্য প্রাইভেট প্রেসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। কাগজ আর কালি সরবরাহ নিশ্চিত করতে আলাদা টিম গঠন করতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ১৯২৩ নাগাদ কালির সংকট দেখা দেয়। ফলে সরকারি নোটের একপাশ ছাপা হতো! আরেকপাশ থাকত ফাঁকা!

১৯২৩ সালের শেষদিকে এসে জার্মানি হাইপার ইনফ্ল্যাশন নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হয়। দেশে-বিদেশে, ঘরে-বাইরে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ক্ষতিপূরণচুক্তি পুনর্বিবেচনা করে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয়। ফলে ১৯২৪ থেকে জার্মানির অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে জার্মানি ইউরোপের প্রধান বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক ভরকেন্দ্র ছিল। উনিশ শতকের শেষদিকে এসে জার্মানি ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতিতে পরিণত হয়। ফলে এখানকার অস্থিরতা গোটা ইউরোপকে তছনছ করে দেবে সেটাই স্বাভাবিক। এমনকি ১৯২১-২৩ পর্যন্ত বুজরুকি কাজ-কারবারের পরও ১৯২৪ থেকে যখন ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে, ১৯২৯ সাল নাগাদ মাত্র পাঁচ বছরে জার্মান অর্থনীতির গতি পৃথিবীর সব দেশকে ছাড়িয়ে যায়। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও!

ইউরোপের দিনকাল ভালোই যাচ্ছিল। জার্মানি, ফ্রান্স-সহ অপরাপর ইউরোপীয় দেশগুলো ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল। শুধু ল্যাংড়াচ্ছিল ইংল্যান্ড—তৎকালীন বিশ্বমোড়ল। কিন্তু বিপর্যয় হানা দেয় আটলান্টিকের ওপার থেকে। ২৮ অক্টোবর, ১৯২৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্টক এক্সচেঞ্জ ধসে পড়ে। দিনটি ছিল সোমবার, যা ব্ল্যাক মন্ডে হিসেবে কুখ্যাত। দিনদিন পরিস্থিতি শোচনীয় থেকে 'শোচনীয়তর' হতে শুরু করে। পতনের ধাক্কা আটলান্টিকের ওপারে—ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রপ্তানিবৃদ্ধিকল্পে মুদ্রামান হ্রাস বা ডিভ্যালুয়েশনের হিড়িক শুরু হয়ে যায়। পাশাপাশি শুরু হয় প্রটেকশনিজম। অর্থনৈতিক ধাওয়া-পালটা-ধাওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পুরোপুরি শেষ হয়নি। বরং যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলেছিল যেসব ফ্যাক্টর, তন্মধ্যে অন্যতম ছিল ১৯২৯ সালের গ্রেট ডিপ্রেশন বা মহামন্দা।

দ্বিতীয় মুদ্রাযুদ্ধ (১৯৬৭-১৯৮৭)

ব্রেটন উডস সিস্টেমে (১৯৪৪ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত) একাধিক ধাক্কা সত্ত্বেও বিশ্ব অর্থব্যবস্থা ভালোই চলছিল। প্রতিআউন্স স্বর্ণের মূল্য ছিল ৩৫ ডলার। অর্থাৎ প্রতিআউন্স স্বর্ণের বিপরীতে ৩৫ ডলার ছাপা যেত। কোনো দেশ ডলারকে স্বর্ণে কনভার্ট করতে চাইলে এই রেশিও অনুযায়ী করতে পারত। অন্যান্য দেশের কারেন্সি ছিল ডলার-বেজড, ফিক্সড রেট। দর পরিবর্তন করতে চাইলে আইএমএফের অনুমতি নিতে হতো।

ব্রেটন উডসের এই 'ভালো আছি' অবস্থার ভেতরে দ্বিতীয় মুদ্রাযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ঘনীভূত হচ্ছিল। গোটা ষাটের দশকজুড়ে। শুরুটা হয়েছিল ১৯৬৪ সালে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় তার ভাইস প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি জনসন। ১৯৬৩-১৯৬৯ পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে

ছিলেন। হোয়াইট হাউজে পা রেখেই তিনি তার 'গানস অ্যান্ড বাটার' পলিসি ঘোষণা করেন।

গান দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ভিয়েতনাম যুদ্ধ, বাটার দ্বারা আমেরিকান সমাজসংস্কার। যার একটি অংশ ছিল দারিদ্র্যবিমোচন। এই উপলক্ষ্যে তিনি একটি পরিকল্পনা পেশ করেন যা দ্য গ্রেইট সোসাইটি নামে পরিচিত।

১৯৫০ সাল থেকে ভিয়েতনামে মার্কিন সেনাবাহিনী ছিল। কিন্তু ১৯৬৫ সালে এসে তা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। সমানতালে যুদ্ধের ব্যয়ও হু হু করে বাড়তে শুরু করে।

প্রথমদিকে মনে হচ্ছিল সবকিছু ভালোই চলছে, কিন্তু গান অ্যান্ড বাটারের ব্যয় যে আমেরিকাকে ভেতর থেকে খোকলা করে দিচ্ছে তা বুঝতে কয়েক বছর সময় লেগেছিল। মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে শুরু করে। ৯৬৫ সালে কাম্য মুদ্রাস্ফীতি ১.৬ পার্সেন্ট থেকে বেড়ে এক বছরেই ৩.৫ পার্সেন্টে গিয়ে ঠেকে। পরবর্তী ২০ বছর মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। যেহেতু ডলারের দাম পড়ছিল, তাই যেসব দেশের হাতে ডলার সঞ্চিত ছিল, তারা ডলার ভাঙিয়ে স্বর্ণ নিয়ে নিচ্ছিল। দ্বিতীয় মুদ্রাযুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল—ডলারের দরপতন।

ওদিকে আটলান্টিকের ওপারেও সংকট তীব্রতর হচ্ছিল। ব্রেটন উডস সিস্টেমে ডলার ছিল মধ্যমণি। কিন্তু ১৯৪৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত ডলারের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ব্রিটিশ স্টার্লিং বা পাউন্ড। কারণ ব্রিটেন ছিল সুপারপাওয়ার। ফলে ১৯৪৫ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভে ডলারের চেয়ে স্টার্লিং এর পরিমাণ বেশি ছিল। ১৯৪৫ সালে ডলার কেন্দ্রে চলে আসার পর সেন্ট্রাল ব্যাংকগুলো স্টার্লিং এর রিজার্ভ কমিয়ে আনতে শুরু করে। যা ব্রিটেনের অর্থনীতি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর প্রভূত চাপ তৈরি করে। ১৯৬৫ সাল নাগাদ বিশ্বে স্টার্লিং এর রিজার্ভ নেমে আসে ২৬ পার্সেন্টে!

স্টার্লিং এর ক্রমাগত পতন, সুয়েজ খাল বন্ধকরণ, ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধ এবং আরও অন্যান্য কারণে ১৯৬৭ সালে ব্রিটেন আইএমএফের অনুমোদন ছাড়াই একচেটিয়াভাবে স্টার্লিং এর দর পুনর্নির্ধারণ করে। সে বছর নভেম্বরের ১৮ তারিখ প্রতিটি স্টার্লিং এর দাম ২.৮০ ডলার থেকে কমিয়ে ২.৪০ ডলার নির্ধারণ করা হয়। প্রায় ১৪.৩ পার্সেন্ট দরপতন। বিগত ২০ বছরে এটি ছিল ব্রেটন উডস সিস্টেমের ওপর সবচেয়ে বড় আঘাত। যা গোটা সিস্টেমের ভিত কাঁপিয়ে দেয়।

ওদিকে যুক্তরাষ্ট্রও চাপের মুখে ছিল। ক্রমাগত স্বর্ণ দিতে দিতে ফতুর প্রায়। ১৯৪৫ সালে আমেরিকার সরকারি স্বর্ণের পরিমাণ ছিল ২০ হাজার টন। ১৯৭১ সালে তা কমে মাত্র ৯ হাজার টনে নেমে আসে। ১৯৭১ থেকে ১৯৮০ নাগাদ আমেরিকার অভ্যন্তরীণ বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আরও ১ হাজার টন বিক্রি করে দিতে হয়েছে। ১৯৭১ সালে ফ্রান্স ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণ তলব করলে প্রেসিডেন্ট নিক্সন আগস্টের ১৫ তারিখ ডলারের বিপরীতে স্বর্ণের বিনিময় বাতিল করে দেন। এর মাধ্যমে ব্রেটন উডস সিস্টেমের আনুষ্ঠানিক দাফনকার্য সম্পন্ন হয়। যদিও আইএমএফ এবং বিশ্ব ব্যাংকের মতো ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে আছে, কিন্তু গোল্ড বেজড এবং ফিক্সড এক্সচেঞ্জ রেটভিত্তিক ব্রেটন উডস অর্থব্যবস্থা নেই।

৭১ পরবর্তী সময়ে অর্থব্যবস্থার অস্থিরতা শুধু বৃদ্ধিই পেয়েছে। ১৯৭৩ সালের আরব-ইজরাইল যুদ্ধের ফলে তেল অবরোধ, ওপেক পুনর্গঠন, পেট্রোডলারের উদ্ভব-সহ নানা ঘটনার পর অবশেষে ১৯৮৭ সালে প্লাজা চুক্তি এবং লুভর চুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব-অর্থব্যবস্থা আপাতত স্থিতিশীল হয়। সমাপ্তি হয় দ্বিতীয় মুদ্রাযুদ্ধের।

অর্থনীতিবিদদের মতে তৃতীয় মুদ্রাযুদ্ধ শুরু হয়েছে ২০১০ সাল থেকে। কবে নাগাদ এটি চূড়ায় পৌঁছবে এবং বর্তমান অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়বে তা অনিশ্চিত। যুদ্ধ চলমান। বইয়ের বাকি অংশে লেখক এই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি, সমস্যা ও আমাদের করণীয় উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন।[১]

* * *

[১] পরিচ্ছেদটি জেমস রিকার্ডসের কারেন্সি ওয়ার্স থেকে অনুপ্রাণিত। সমস্ত তথ্য এই বইয়ের দ্বিতীয় অংশ থেকে সংগৃহীত।

আমাদের এই বইয়ের—'দ্য নিউ কেস ফর গোল্ড'—আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এটি প্রমাণ করা যে স্বর্ণই অর্থ। স্বর্ণের ওপর ভিত্তি করে অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব, বরং কাম্য। এবং যেহেতু অফিশিয়ালি এখন কোনো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড নেই, তাই মানুষের উচিত হচ্ছে 'ব্যক্তিগত গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড' গড়ে তোলা। স্বর্ণ কিনে রাখা, সম্পদ জমা করা।

এটি অবশ্যই স্বস্তিদায়ক যে স্বর্ণাচারী আমি একা না। স্বর্ণবিরোধী নতুন প্রজন্মের পাশাপাশি আরও একটা স্মার্ট, সুচিন্তক 'স্বর্ণপন্থী' প্রজন্ম গড়ে উঠেছে। যারা সর্বতোভাবে 'স্বর্ণ' প্রচার করে। এই তরুণ 'স্বর্ণপন্থীদের' তালিকায় রয়েছে ভিয়েনার রনি স্টোফের্ল, মার্ক ভালেক। সিডনির জর্ডান এলিয়েসো এবং জেনি সিম্পসন। লন্ডনের জ্যান স্কয়লেস। নেদারল্যান্ডের কোস জ্যানসেন এবং ভ্যাঙ্কুবারের ডিয়ান টেইলর। পুরো একটা নেটওয়ার্ক! তারা আমার অফুরন্ত উদ্যম আর নিত্যনতুন অন্তর্জ্ঞানের উৎস।

স্বর্ণের পক্ষে আমাদের বিতর্ক উপস্থাপনের পূর্বে স্বর্ণের বিপক্ষে যেসব যুক্তি উত্থাপন করা হয় সেগুলো খণ্ডন করাটা 'স্বাস্থ্যকর' মনে হচ্ছে। ভবিষ্যতে কোনো স্বর্ণবিরোধী আপনার সামনে তার ঝুলি খুলে বসলে যেন স্মার্টলি তাকে থামিয়ে দিতে পারেন, বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করে প্রত্যুত্তর দিতে পারেন। ম্যাদা মেরে থাকতে না হয়।

তো স্বর্ণের বিরুদ্ধে আপত্তিগুলো কী? যদিও স্বর্ণবিরোধীদের এগুলো একদম আত্মস্থ, আপনাদের সুবিধার্থে বলছি—তালিকাটা নিম্নরূপ।

- ❑ জন মেইনার্ড কেইনসের ভাষ্যমতে স্বর্ণ একটি 'বার্বারিক ধ্বংসাবশেষ'।
- ❑ অর্থায়ন এবং বাণিজ্য পরিচালনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ মজুত নেই।
- ❑ বিশ্বের প্রবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে স্বর্ণ সরবরাহ যথেষ্ট দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পায় না।
- ❑ স্বর্ণের কারণে ১৯২৯ সালের অর্থনৈতিক মহামন্দা দেখা দিয়েছিল, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অপরিহার্য করে তুলেছিল।
- ❑ স্বর্ণের প্রবৃদ্ধি নেই।
- ❑ স্বর্ণের স্বকীয় কোনো মূল্য নেই।

প্রতিটা আপত্তিই হয়তো অতীব 'শীর্ণকায়', ভুল কিংবা কখনো স্বর্ণের পক্ষে! তবুও কাগুজে টাকার পূজারিরা এগুলো তোতার বুলির মতো আওড়ে যাচ্ছে। চলুন, ব্যবচ্ছেদ শুরু করা যাক।

জন মেইনার্ড কেইনসের মতে স্বর্ণ হচ্ছে বর্বরযুগের স্মৃতিচিহ্ন

এটি খণ্ডন করা সবচেয়ে সহজ—কেইনস কখনোই এ কথা বলেননি! তিনি যা বলেছেন তা বেশ চমকপ্রদ। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত তার Monetary Reform (অর্থনৈতিক পুনর্গঠন) বইতে লেখেন, 'সত্য বলতে *গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড* একটি বার্বারিক ধ্বংসাবশেষ'। লক্ষ করুন, তিনি গোল্ড নিয়ে কথা বলছেন না, বলছেন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে। সময়টাও লক্ষ করুন—১৯২৪ সাল। সে সময়ের প্রেক্ষাপটে তার কথা সঠিক।

মূলত ১৯২২ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত বিদ্যমান কুখ্যাত ও ত্রুটিপূর্ণ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করাটাই কখনো উচিত হয়নি। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকালে এই গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের মৃত্যুর বহুপূর্বেই এটি পরিত্যাগ করা উচিত ছিল। কেইনস ছিলেন একজন বাস্তববাদী ঝানু অর্থনীতিবিদ।

তিনি বর্তমান ম্যাক্রো ইকোনোমিক্সের জনক বিবেচিত। ইতিপূর্বে এডাম স্মিথের ক্লাসিক্যাল পুঁজিবাদী অর্থনীতিই ছিল আরাধ্য ও অপ্রতিরোধ্য। যার সারকথা ছিল—অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণে ব্যক্তিই সর্বসেবা। রাষ্ট্র কখনোই অর্থনীতিতে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। এটি লেসে ফেয়ার বা লেসেজ ফেয়ার (Laissez-faire) পলিসি পরিচিত। এই অর্থব্যবস্থার ভয়াবহ কুফলে বিশ্ব যখন বিপর্যস্ত, কেইনস তখন ম্যাক্রো ইকোনোমিক্সের ধারণা প্রবর্তন করেন। যার মোদ্দাকথা হচ্ছে—অর্থনীতি সচল রাখতে রাষ্ট্রের সুনিয়ন্ত্রিত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। এখন আমরা যে অর্থনীতি দেখি তা মূলত কেইনসিয়ান অর্থনীতি। ক্লাসিক্যাল লেসে ফেয়ার অর্থনীতি এখন বিশ্বের কোনো দেশেই প্রচলিত না। (Economics by Paul A. Samuelson)

১৯১৪ সালের জুলাইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকালে কেইনস ১৮৭০ সাল থেকে চলমান ক্লাসিক্যাল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বহাল রাখার পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। সে সময় যেসব দেশ বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করছিল, তারা তাদের হাতে থাকা স্বর্ণ দিয়ে যুদ্ধে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড পরিত্যাগ করছিল। কারণ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড পরিত্যাগ করলে যত খুশি টাকা ছাপা যাবে, যেটা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে থেকে সম্ভব না। কারণ এখানে স্বর্ণের আনুপাতিক হারে টাকা ছাপতে হয়। ব্রিটিশ রাজ কোষাগার এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ডও একই কাজ করতে আগ্রহী ছিল।

কেইনসের বক্তব্য ছিল—অর্থ হিসেবে স্বর্ণের জোগান সীমিত। পক্ষান্তরে ঋণ ক্রমবর্ধমান। ব্রিটেন ছিল তৎকালীন সুপারপাওয়ার এবং বিশ্ববাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। ফলে ব্রিটেন যদি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ধরে রাখে, তবে যুদ্ধের ব্যয় মেটানোর জন্য সে চাইলে অধিকতর ঋণ নিতে পারবে। কারণ স্বর্ণের ওপর আস্থাশীলতার কারণে দাতা

দেশগুলো ঋণ দিতে সম্মত হবে। এভাবে সে চাইলে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড পরিত্যাগ করে টাকা ছাপা ব্যতীতই ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করতে পারে। কেইনসের কথা ফলেছিল। হুবহু। নিউইয়র্কে হাউজ অব মর্গান যুক্তরাজ্যের জন্য ব্যাপক ঋণ উত্তোলনের উদ্যোগ নেয়। যুদ্ধে ব্রিটেনের প্রতিপক্ষ জার্মানি বা অস্ট্রিয়া এরকম কোনো সুবিধা পায়নি। যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল ১৯১৭ সালে। ব্রিটেন সে পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই ঋণ প্রভূত সহায়তা করেছিল। মূলত দুই-দুইটা বিশ্বযুদ্ধেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছিল অর্থনৈতিক সক্ষমতা আর প্রোডাকশনের ভিত্তিতে। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে অংশগ্রহণের পরপরই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি পালটে যায়। পরবর্তী বছরই বিজয় ধরা দেয়।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আমেরিকার নীতি ছিল আইসোলেশনিজম বা নিঃসঙ্গবাদ। তাদের যুক্তি ছিল ইউরোপের যুদ্ধবিগ্রহে তাদের জড়ানোর প্রয়োজন নেই। তারা তখন নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতিতে মনোনিবেশ করেছিল। ফলে দেখা যায় দুটি বিশ্বযুদ্ধেই আমেরিকা ছিল বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি এবং মূলত দুটি বিশ্বযুদ্ধেই আমেরিকার অংশগ্রহণের পর ক্ষমতার ভারসাম্যে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ইউরোপীয় শক্তিগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে আমেরিকার একক উত্থান ঘটে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ডলার হয়ে ওঠে গ্লোবাল রিজার্ভ কারেন্সি।

১৯২৫ সালে উইন্সটন চার্চিল, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, যুক্তরাজ্যের চ্যান্সেলার অব এক্সচেকারের (অর্থমন্ত্রী) দায়িত্ব পান। তার ইচ্ছা ছিল যুক্তরাজ্যকে যুদ্ধ-পূর্ববর্তী গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কেইনস তাকে বলেছিলেন এতে 'মুদ্রাস্ফীতি-তাণ্ডব' শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তিনি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড সমর্থন করেননি। পাশাপাশি তিনি বলেছিলেন যদি ব্রিটেন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে ফিরে যেতেই চায়, সে ক্ষেত্রে স্বর্ণের সঠিক দাম নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি স্বর্ণের উচ্চমূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব করেছিলেন।

চার্চিল কেইনসের কথা পাত্তা দেননি। ফলাফল? ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি এবং গ্রেট ব্রিটেনে অর্থনৈতিক মন্দার হানা। কয়েক বছরের মধ্যে এই মন্দা গোটা বিশ্বকে গ্রাস করে নেয়। যা দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন বা অর্থনৈতিক মহামন্দা পরিচিত। ১৯৪৪ সালে কেইনস যখন জীবন সায়াহ্নে, তখনো তিনি ব্রেটন উডস কনফারেন্সে একটি নতুন বিশ্ব-অর্থনীতির কথা বলেছিলেন; দ্য ব্যাঙ্কর (the Bancor)। যা ছিল বর্তমান স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস বা এসডিআর এর পূর্বসূরি। এসডিআর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড বা আইএমএফ-এর একটি রিজার্ভ সিস্টেম। পাঁচটি দেশের 'মুদ্রা-ঝুড়ির' ওপর ভিত্তিশীল। সদস্য দেশগুলোর সরকারি রিজার্ভে সংকট দেখা দিলে এখান থেকে আনুপাতিক হারে সহায়তা প্রদান করা হয়। আবার

দশগুলো চাইলে অন্য দেশের নিকট নিজেদের এসডিআর বিক্রি করে সেখান থেকে অর্থ বা পণ্য সংগ্রহ করতে পারে।[১]

প্রতিবছর বিশ্বের সব দেশের বাজেটে সেই বছরের মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাহ্রাস উল্লেখ করা হয় এবং আগামী বছর মুদ্রাস্ফীতি কতটুকু মাত্রায় ধরে রাখার চেষ্টা করবে তাও উল্লেখ করা হয়। মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে টাকার মান হ্রাস পাওয়া। যেমন এই বছর যদি আমি এক কেজি চাল ১১ টাকায় ক্রয় করি, গত বছর যার দাম ছিল ১০ টাকা। এর অর্থ হচ্ছে এই বছর টাকার মান ১০ শতাংশ কমেছে। বা ভিন্নভাবে বললে এই বছর মুদ্রাস্ফীতি ১০ শতাংশ।

মুদ্রাস্ফীতি কীভাবে নির্ধারিত হয়? প্রতিটি দেশের এমন কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের তালিকা করা হয় যা জনসাধারণের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। একে বলা হয় *বাস্কেট অব গুডস* বা পণ্যঝুড়ি। নিয়মিত একটি বিরতিতে—কখনো মাসিক, কখনো বার্ষিক, কখনো বা ষাণ্মাষিক, বাস্কেট অব গুডসের দাম কী পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি পেল তার মাধ্যমে টাকার মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি (ইনফ্ল্যাশন) বা মুদ্রাহ্রাস (ডিফ্ল্যাশন) নির্ধারিত হয় বাস্কেট অব গুডসের মাধ্যমে।

কেইনস দ্য ব্যাঙ্করের জন্যও একটি *বাস্কেট অব গুডস* প্রস্তাব করেছিলেন যাতে স্বর্ণও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যদিও এটি পুরোপুরি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ছিল না কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় স্বর্ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করেছিল। আমেরিকার প্রস্তাবিত ডলার—গোল্ড অর্থব্যবস্থার চাপে, যা ১৯৪৪ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বলবৎ ছিল, কেইনসের প্রস্তাবনা ধামাচাপা পড়ে যায়।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কেইনস তার ক্যারিয়ারের শুরুতে স্বর্ণের সমর্থক ছিলেন। ক্যারিয়ারের মধ্যভাগে ছিলেন সচেতন 'স্বর্ণবাদী' এবং শেষভাগে পুনরায় স্বর্ণের পক্ষাবলম্বন করেছেন। মূলত তিনি ক্রটিপূর্ণ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের বিপক্ষে ছিলেন। পরবর্তী সময়ে যখন কেউ বলবে 'স্বর্ণ তো বার্বারিক ধ্বংসাবশেষ', কেইনসের উপর্যুক্ত সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো মাথায় রাখবেন।

অর্থায়ন ও বাণিজ্য পরিচালনার মতো যথেষ্ট স্বর্ণ মজুত নেই?

যদিও এটি একটি ননসেন্স বকওয়াজ, তবু 'মানিফ্যানদের' সবচেয়ে গুরুতর ভুলের কারণে এই বিষয়ে আমাদের কথা বলতে হচ্ছে।

বিশ্বে সবসময়ই স্বর্ণের একটা সুনির্দিষ্ট মজুত ছিল, এবং নতুন নতুন খনি আবিষ্কারের ফলে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে স্বর্ণের মজুত ১ লাখ

[১] https://fliplink.io/Vu0uJ

৭০ হাজার মেট্রিক টন। এর মধ্যে ৩৫ হাজার মেট্রিক টন হচ্ছে অফিশিয়াল স্বর্ণ যা বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, অর্থমন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য স্বাধীন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের হাতে রয়েছে। এই পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে বিশ্বের যেকোনো অর্থায়ন এবং বাণিজ্য পরিচালনা সম্ভব। প্রয়োজন শুধু যথাযথভাবে বাস্তব স্বর্ণের রেশিও অনুযায়ী অর্থ সরবরাহ (মানি সাপ্লাই) নিশ্চিত করা।

যথাযথ এর জন্য আমাদের কিছু পূর্বানুমানের প্রয়োজন হবে। যেমন, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে কোন কোন কারেন্সি অন্তর্ভুক্ত হবে? কোন অর্থ সরবরাহ পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে? স্বর্ণ-অর্থের কোন রেশিওটা সবচেয়ে ভালো? এগুলো ফসিল খুঁজে উদ্ধার করে আনা কোনো ডাইনোসোর নয়; বরং কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে এসব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে হয়।

১৮১৫ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত ব্যাংক অব ইংল্যান্ড অত্যন্ত সফলতার সাথে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ধরে রেখেছিল। এ ক্ষেত্রে অর্থের বিপরীতে ২০ শতাংশ স্বর্ণ থাকত। ১৯১৩ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ডলারের বিপরীতে ৪০ শতাংশ স্বর্ণ রাখতে হতো। মূলত গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে স্বর্ণের পরিমাণ নির্ধারিত হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর জনগণের আস্থার ভিত্তিতে। আস্থা যত বেশি, অর্থের বিপরীতে স্বর্ণের পরিমাণ তত কম।

এখানে এই আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, যদি প্রতিআউন্স স্বর্ণের দাম এগারো শ ডলার ধরে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ঘোষণা করা হয়; তবে হয়তো ভয়াবহ মুদ্রাহ্রাস (ডিফ্ল্যাশন) দেখা দেবে। অর্থাৎ বাজারে টাকার সরবরাহ কমাতে হবে, ফলে টাকার দাম বেড়ে যাবে। অথবা এটি হবে খুবই অস্থিতিশীল। কারণ স্বর্ণের স্বল্পমূল্যের কারণে মানুষ সরকারের নিকট থেকে স্বর্ণ কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

এই আপত্তির জবাবে সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলি যে, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ধরে রাখার মতো স্বর্ণের মজুত সবসময়ই ছিল এবং আছে, যদি আপনি যথাযথভাবে স্থিতিশীল এবং নন-ডিফ্রেশনারি দাম নির্ধারণ করতে পারেন।

মূলত যখন তারা বলে, 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড চালানোর মতো পর্যাপ্ত স্বর্ণ মজুত নেই', তাদের কথার মর্ম হচ্ছে বর্তমান বাজারমূল্য অনুযায়ী পর্যাপ্ত স্বর্ণ নেই। এটি দরনির্ধারণের ত্রুটি, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের ত্রুটি নয়। ফলে অভিযোগের লক্ষ্যবস্তুও গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের পরিবর্তে দরনির্ধারণই হওয়া উচিত। পেপারকারেন্সি (কাগুজে টাকা) ও স্বর্ণের মূল্যের এই বৈপরীত্ব তখনই আমাদের চোখে বাস্তব হয়ে ধরা দেবে, যখন পেপার কারেন্সির ওপর আমরা আস্থা হারিয়ে ফেলব, এবং অর্থনৈতিক সিস্টেমের ওপর আমাদের পুনঃআস্থা আনয়নের জন্য স্বর্ণের দ্বারস্থ হতে হবে।

বিশ্বপ্রবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে স্বর্ণ দ্রুত বর্ধনশীল নয়?

এটি আরেকটি হাস্যকর মূর্খতা, যা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড কীভাবে কাজ করে তা না বোঝার ফলে তৈরি হয়েছে। কোনো সমালোচক এই আলাপ তুললে বুঝতে হবে সে স্বর্ণের 'অফিশিয়াল মজুত' আর 'প্রকৃত মজুত'-এর পার্থক্য জানে না। অফিশিয়াল স্বর্ণ হচ্ছে যা সরকারের হাতে থাকে, এবং তা অর্থ সরবরাহ (মানি সাপ্লাই) নির্ধারণে ব্যবহারযোগ্য। আর প্রকৃত মজুত বলতে বোঝানো হয় অফিশিয়াল মজুত প্লাস অন্যান্য স্বর্ণের সম্মিলিত মজুত। চাই তা হোক স্বর্ণের ঝালর, বার কিংবা জুয়েলারি।

সরকার যদি অফিশিয়াল স্বর্ণের মজুত বাড়াতে চায়; তবে যা করতে হবে তা হচ্ছে, টাকা ছাপাতে হবে এবং জনগণের হাতে থাকা স্বর্ণ মুক্তবাজার থেকে কিনে নিতে হবে। নতুন নতুন খনির আবিষ্কার কোনো বাধা নয়। সরকার যদি অফিশিয়াল স্বর্ণ দ্বিগুণও করতে চায়, প্রাইভেট মালিকানায় থাকা স্বর্ণ কিনে নেওয়ার মাধ্যমে সহজেই তা করতে পারে। এবং সরকারি স্বর্ণের তারতম্যের ফলে বিশ্বের মোট স্বর্ণের পরিমাণে কোনো পরিবর্তন আসবে না। বর্তমান বিশ্বের মোট স্বর্ণের মাত্র ২০ শতাংশ অফিশিয়াল গোল্ড। ফলে অফিশিয়াল গোল্ডের পরিমাণ বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সরকার চাইলেই তা করতে পারে এবং অর্থ সরবরাহে তা ব্যবহার করতে পারে।

গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে স্বর্ণ কিনে নেওয়ার জন্য টাকা ছাপানো একটি নিত্যনৈমিত্তিক ওপেন মার্কেট পলিসি যা বর্তমান অর্থব্যবস্থায় ফেডারেল রিজার্ভ বন্ড কিনে নেওয়ার জন্য প্রতিদিনই করে থাকে। হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে বাজারের ওপর টাকা ছাপানোর প্রভাব পড়ে। অসচেতন অর্থনৈতিক পলিসি ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। তবে তা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড এবং কাগুজে টাকা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এবং গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে নতুন নতুন খনি আবিষ্কার, সেগুলো থেকে উত্তোলিত স্বর্ণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণবিস্তার ক্ষমতাকে ব্যাহত করবে না।

আরও সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য আমরা ২০০৯ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত বার্ষিক প্রবৃদ্ধির দিকে নজর বোলাতে পারি—

গ্লোবাল জিডিপি	২.৯%
বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধি	১.২%
স্বর্ণ উৎপাদন	১.৬%
ফেডারেল রিজার্ভ মনিটরি বেজ	২২.৫%

জিডিপি হচ্ছে Gross Domestic Production, অর্থাৎ কোনো দেশের সীমানার ভেতর সুনির্দিষ্ট একটা সময়ে—যেমন এক বছর—উৎপাদিত মোট পণ্য ও সেবার মূল্য। আরেকটু পরিষ্কার করে বললে—বাংলাদেশে প্রতিবছর অনেক পণ্য উৎপাদিত হয়। যেমন গার্মেন্টস প্রোডাক্ট, প্রাণ-আরএফএলের পণ্য, জাহাজ, প্লাইউড পণ্য-সহ আরও অনেক কিছু। এগুলোর একটা মূল্য আছে। পাশাপাশি দেশের ভেতর কিছু ‘সেবা’ উৎপন্ন হয়। যেমন কোনো ডাক্তার আমার অপারেশন করে দিলেন, বিনিময়ে তিনি টাকা নেন। একজন আইনজীবী আইনি পরামর্শ দিয়ে ফি নেন। এসব ক্ষেত্রে তারা কোনো পণ্য উৎপাদন করছেন না; বরং একটা সেবা দিচ্ছেন। কিন্তু সেই সেবার বাজারমূল্য রয়েছে। এভাবে বাংলাদেশের সীমানার ভেতর উৎপাদিত পণ্য ও সেবার বাজারমূল্যই হচ্ছে বাংলাদেশের জিডিপি।

ওপরের চার্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্লোবাল জিডিপির (২.৯) প্রবৃদ্ধি স্বর্ণ উৎপাদনের (১.৬) পরিমাণের চেয়ে বেশি। বিশ্ব জিডিপি স্বর্ণ উৎপাদনের চেয়ে দ্রুত বর্ধিত হচ্ছে। যদিও জিডিপির হারই একমাত্র ফ্যাক্টর নয়, এখানে আরও অনেক অ-অর্থনৈতিক বাধাবিপত্তি রয়েছে। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি আমরা ধরেও নিই যে শুধু এটিই একমাত্র ফ্যাক্টর, তবুও গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের কারণে বিশ্বের প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হবে না; বরং পৃথিবী তার নিজস্ব গতিতেই এগোতে পারবে। সর্বোচ্চ সম্ভাব্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে পণ্যের অর্থমূল্য (নমিনাল প্রাইস) হয়তো কিছুটা হ্রাস পাবে। এতে ক্ষতি নেই; বরং সীমিত ও যথাযথ মাত্রার মুদ্রাহ্রাস (ডিফ্ল্যাশন) ভোক্তা ও সঞ্চয়কারীদের জন্য উপকারী।

মুদ্রাস্ফীতি (ইনফ্ল্যাশন বা টাকার মূল্য কমে যাওয়া) এবং মুদ্রাহ্রাস (ডিফ্ল্যাশন বা টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া) উভয়টিরই ভালো ও মন্দ দুটি দিক রয়েছে। যেমন যদি টাকার মূল্য কমে যায় তবে দেশের ভেতরের ভোক্তা বা সাধারণ ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে পণ্যটা তারা ১০ টাকায় কিনতে পারত সেটা হয়তো এখন ১১ টাকায় কিনতে হবে। কিন্তু রপ্তানিকারকরা লাভবান হয়। ধরি, একজন গার্মেন্টস মালিক ১০ ডলার মূল্যের একটা অর্ডার পেয়েছে। যখন অর্ডার পেয়েছে তখন প্রতিডলারের মূল্য ছিল ৮০ টাকা। কিন্তু টাকার দাম কমে গেছে, এখন প্রতিডলারের মূল্য দাঁড়িয়েছে ৯০ টাকা। তো এই রপ্তানিকারক ১০ ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করে যখন অর্ডার পেয়েছে, তখনকার যদিও আয় করেছে ডলারপ্রতি ৮০ টাকা। কিন্তু সেই একই পণ্য রপ্তানি করে এখন সে পাবে ডলারপ্রতি ৯০ টাকা। তার বিদেশি ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করবে ডলারে। সেটা সে ভাঙিয়ে টাকায় রূপান্তর করবে। ফলে টাকার মূল্য কমে যাওয়ায় ডলার ভাঙিয়ে সে এখন বেশি পরিমাণ টাকা পাবে। অনুরূপ মুদ্রাহ্রাস (ডিফ্ল্যাশন বা টাকার দাম বৃদ্ধি) হলে রপ্তানিকারকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু সাধারণ ক্রেতারা লাভবান হয়। কারণ তারা

আগে যে পণ্যটা ১০ টাকায় কিনত, এখন সেটা হয়তো নয় টাকায় কিনতে পারবে।[১]

আদতে বর্তমান অর্থব্যবস্থার সাথে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের যুগপৎ সচেতন মিশ্রণ না করার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। বরং যুদ্ধকালীন সময়টুকু ছাড়া ১৮১৫-১৯৭১ পুরো সময়জুড়ে সেন্ট্রাল ব্যাংকের অর্থ স্বর্ণের সাথে মিলেমিশেই চলেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক লেন্ডার অব লাস্ট রিজোর্ট কাজ করেছে। গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের সময়েও ব্যাংক যা যথার্থ মনে করেছে সেই অনুপাতে অর্থ সরবরাহ কিংবা সংকোচন করেছে। মূলত তখন সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রধান কাজ ছিল স্বর্ণের বারের আগমন-নির্গমনের ওপর ভিত্তি করে যথাযথ অর্থনৈতিক পলিসি নির্ধারণ করা।

যখন সমালোচকরা বলে যে স্বর্ণ উৎপাদন বিশ্বপ্রবৃদ্ধির সাথে তাল মেলাতে সক্ষম না, তাদের কথার মূল মর্ম হচ্ছে—স্বর্ণের উৎপাদন বর্তমান 'ইনফ্ল্যাশনারি' বিশ্বপ্রবৃদ্ধির সাথে তাল মেলাতে সক্ষম না। ইনফ্ল্যাশনারি (নমিনাল) প্রবৃদ্ধি আর বাস্তব বা রিয়েল প্রবৃদ্ধির মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

স্বর্ণের কারণে অর্থনৈতিক মহামন্দা দেখা দিয়েছিল?

মূলত মহামন্দা হয়েছিল ১৯২৭ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের অদক্ষ অর্থনৈতিক পলিসির কারণে। বহু ঝানু অর্থনীতিবিদ এ কথা স্বীকার করেছেন। এদের মাঝে রয়েছেন দীর্ঘ সময়ের অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ এ্যানা শোর্টজ (Anna Schwartz), মিল্টন ফ্রাইডম্যান এবং অতি সম্প্রতি বেন বেরনাঙ্ক (Ben Bernanke)। পাশাপাশি মহামন্দা দীর্ঘায়ত হয়েছিল হার্বার্ট হুবার এবং ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের 'পরীক্ষামূলক' পলিসির বারংবার বাগড়া দেওয়ার ফলে। চার্লস কিন্ডেলবার্গার ও অন্যান্য স্কলারদের মতে এসব এক্সপেরিমেন্টের ফলে 'রেজিম আনসার্টেইন্টি' তৈরি হয়েছিল। যার অর্থ হচ্ছে বড় বড় করপোরেশন এবং ধনকুবেররা পুঁজি বিনিয়োগে দ্বিধান্বিত ছিল এবং অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। কারণ তারা সরকারের নীতিনির্ধারণ, ট্যাক্স এবং শ্রমমজুরি নিয়ে নিশ্চিত ছিল না। ফলে পুঁজি সাইডলাইনে চলে গিয়েছিল, প্রবৃদ্ধি ধুঁকছিল। বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল।

বেরনাঙ্ক গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে গ্রেট ডিপ্রেশনের গোটা সময়ের কোনো মুহূর্তেই স্বর্ণস্বল্পতার কারণে অর্থ সরবরাহে বাধাগ্রস্ত হয়নি। আইন করে যখন ফেডারেল রিজার্ভকে আহরিত স্বর্ণের ২৫০ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ ছাপানোর অনুমতি দেওয়া হলো, তখনো বাস্তব অর্থ সরবরাহ মোট স্বর্ণের ১০০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়নি। আইনে ২৫০ শতাংশ পর্যন্ত অনুমতি দিলেও এর প্রয়োজন হয়নি। ফলে

---

[১] Paul A. Samuelson, *Economics*, McGraw Hill; 19th edition, 2009

বলা যায় কোনো বাধা ছাড়াই অর্থ দ্বিগুণ করা সম্ভব, স্বর্ণ এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে না। অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বর্ণ বাধা ছিল না, প্রকৃত সমস্যা ছিল ক্রেতারা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণে রাজি ছিল না, ব্যাংকও দিতে রাজি ছিল না। ব্যাংকের ঋণপ্রদান সক্ষমতার ঘাটতি আর ক্রেতাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল সমস্যার মূল কেন্দ্র, স্বর্ণ নয়।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বেরি আইচেনগ্রিন দেখিয়েছেন যেসব দেশ স্বর্ণের বিপরীতে নিজেদের কারেন্সির মূল্য কমিয়ে দিয়েছিল, তারা এর তাৎক্ষণিক সুফল ভোগ করেছিল। তাদের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। যেমন ফ্রান্স ১৯২৫ সালে, ব্রিটেন ১৯৩১ সালে, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৩ সালে এবং পুনরায় যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স সম্মিলিতভাবে ১৯৩৬ সালে কারেন্সির মূল্য কমিয়েছিল। তবে এটা সত্য যে, যেসব দেশ নিজেদের কারেন্সিমূল্য হ্রাস করেছিল, তাদের অর্থনৈতিক সুফল ছিল স্বল্পমেয়াদি। ১৯২৫ সালে ফ্রান্স লাভবান হয়েছিল যুক্তরাজ্যের ক্ষতির বিনিময়ে, আবার ১৯৩১ সালে ফ্রান্সের বারোটা বাজিয়ে যুক্তরাজ্যের বাজিমাত হয়েছিল। ওদিকে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৩ সালে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স উভয়ের ক্ষতির বিনিময়ে নিজেদের লাভ ধরে রেখেছিল।

তবে আইচেনগ্রিনের ব্রিলিয়ান্ট গবেষণার কিছু সমস্যাও আছে। কেইনসের ভাষায় একে বলা হয় 'ফ্যালাসি অব কম্পোজিশন'। অর্থাৎ এক ব্যক্তির জন্য যা উপকারী, ব্যক্তিসমষ্টির জন্য তা উপকারী নাও হতে পারে। যেমন কোনো জনাকীর্ণ অনুষ্ঠানে কেউ যদি চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, তবে সে হয়তো স্টেজ ভালোভাবে দেখতে পাবে। কিন্তু অনুষ্ঠানের সবাই যদি তার অনুসরণ করে 'ভালোভাবে দেখার' জন্য চেয়ারে উঠে যায়? কেউ কিছুই দেখতে পাবে না।

১৯২৫ থেকে ১৯৩৬ নাগাদ চলমান কারেন্সি ওয়ার ছিল অনেকটা 'beggar thy neighbor' তুল্য। সংকটের চূড়ান্ত ঢেউ আসে যখন ১৯২৫ সালে ব্রিটেন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধপূর্ব রেটে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তারা এক আউন্স সমান ৪.২৫ ইউরো নির্ধারণ করেছিল। ১৯১৪ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত ব্রিটেন যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সরবরাহ প্রায় দ্বিগুণ করেছিল। ফলে হঠাৎ যুদ্ধপূর্ব রেটে ফিরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তাদের অর্ধেক অর্থবাজার থেকে তুলে নিতে হবে। এই পলিসির ফলে তীব্র ডিফ্ল্যাশন বা মুদ্রাহ্রাস দেখা দেয়। ব্রিটিশ পাউন্ডের এই অতিমূল্যের ফলে ফ্রান্স বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হতে শুরু করে। অবশেষে ১৯৩১ সালে ব্রিটেন তাদের পুরাতন রেট থেকে সরে আসে যা তাদের বেনিফিট দিতে শুরু করে। বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায়। এই অবস্থা ১৯৩৩ পর্যন্ত চলমান ছিল। ১৯৩৩ এ এসে যুক্তরাষ্ট্রও তার পুরাতন রেট ভেঙে দেয়।

ফলে দেখা যাচ্ছে স্বর্ণের কারণে গ্রেট ডিপ্রেশন হয়নি, হয়েছিল রাজনৈতিক বিবেচনায় স্বর্ণের মূল্য নির্ধারণ এবং অদক্ষ অর্থনৈতিক পলিসির কারণে। সফল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড কার্যকর করার জন্য স্বর্ণের যেন অবমূল্যায়ন না হয় তা লক্ষ রাখা জরুরি, যা ১৯২৫ সালে ব্রিটেন এবং বর্তমানে গোটা বিশ্ব করতে ব্যর্থ হচ্ছে। স্বর্ণের অবমূল্যায়নের অর্থ হচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যাংকের মুদ্রার অতিমূল্যায়ন। ফলাফল? মুদ্রাহ্রাস বা ডিফ্ল্যাশন। শেষকথা হচ্ছে—গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড খুব ভালোভাবেই চলতে সক্ষম যদি সরকারগুলো রাজনৈতিক বিবেচনায় স্বর্ণের দাম নির্ধারণের পরিবর্তে বাস্তববাদিতার পরিচয় দেয়। গবেষণার ভিত্তিতে দাম নির্ধারণ করে।

স্বর্ণের প্রবৃদ্ধি নেই?

এই বক্তব্য সঠিক। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এটি বরং স্বর্ণের পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তিগুলোর একটি!

যেমন আপনি যদি একটি জমি কিনে রাখেন, তা থেকে ফল-ফসল আসবে। অনুরূপ কোনো ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে সেখান থেকে লাভ আসবে। কিন্তু সেই 'অর্থটা' যদি ঘরে রেখে দেন তবে তা থেকে কোনো প্রবৃদ্ধি আসবে না। ১০ ভরি স্বর্ণ কিনে ঘরে রেখে দিলে তা কখনোই ১১ ভরি হবে না।

এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে প্রবৃদ্ধি বা লাভ তখনই আসে যখন রিস্ক নেওয়া হয়। যেমন বিনিয়োগে রিস্ক আছে। প্রবৃদ্ধিও আছে। কিন্তু আমি যদি টাকা ঘরে রেখে দিই এতে রিস্ক নেই, তাই প্রবৃদ্ধিও নেই।

তো স্বর্ণেরও প্রবৃদ্ধি নেই, থাকার কথাও নয়। কারণ এটি হচ্ছে মানি, আর মানির প্রবৃদ্ধি নেই। যেহেতু রিস্ক নেই। বরং মানি হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্য সংরক্ষণের মাধ্যম। প্রকৃত 'মানি বা অর্থ' কখনোই রিস্ক অ্যাসেট নয়। টাকার কথাই ধরুন, এটি কি 'অর্থ বা মানি'? হ্যাঁ। এর কি প্রবৃদ্ধি আছে? না। ঘরে ১০ টাকা রেখে দিলে তা ১০ টাকাই থেকে যাবে। তবে টাকার প্রবৃদ্ধি আছে; যদি আপনি সেটা ব্যাংকে রাখেন। সেখান থেকে লাভ আসবে। কিন্তু তখন এটি আর মানি থাকবে না, ব্যাংক 'ডিপোজিট' হয়ে যাবে।

ব্যাংক ডিপোজিট মানি নয়; বরং এটি ব্যাংকের অনিশ্চিত দায়। ২০১৩ সালে সাইপ্রাস এবং ২০১৫ সালে গ্রিস ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার মাধ্যমে ব্যাংক ডিপোজিট আর মানির পার্থক্য হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। উভয় দেশেই ব্যাংক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এটিএম বুথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কাগুজে টাকার সংকট দেখা দেয়। সাইপ্রাসে অনেকে তাদের ব্যাংক ডিপোজিটকে ব্যাংক স্টকে পরিবর্তন করে নেয় অর্থাৎ ডিপোজিটের বিনিময়ে ব্যাংকের শেয়ার কিনে নেয়। গ্রিসেও ক্রেডিট কার্ড

চলছিল না, ফলে আধা-বার্টার (বার্টার হচ্ছে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য কেনা, যেমন চাল দিয়ে ডাল) অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। যদি ব্যাংক ডিপোজিট মানিই হতো, তবে এর 'মূল্য' খোয়া যেত না। কিন্তু গিয়েছে, কেন? কারণ এটি রিস্ক অ্যাসেট, মানি নয়।

শেয়ার, বন্ড, রিয়েল এস্টেট কিংবা অন্য কোনো নন-মানি সম্পত্তি কেনার মাধ্যমে আপনি প্রবৃদ্ধি পেতে পারেন। কিন্তু সেখানে রিস্কও আছে। অনেক বিনিয়োগকারী অবশ্য শেয়ার, বন্ড ও রিয়েল এস্টেটকে মানি মনে করেন। রিস্ক ফ্রি ভাবেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এগুলোও ব্যাংক ডিপোজিটের মতোই রিস্ক অ্যাসেট।

স্বর্ণ, কারেন্সি (সব দেশের সরকারি মুদ্রা যেমন ডলার, ইউরো, রুপি, টাকা) এবং বিটকয়েন—এই তিনটি হচ্ছে মানি বা অর্থের তিনটি রূপ। একটি ধাতব, একটি কাগুজে, আরেকটি ডিজিটাল। এগুলোর কোনোটিরই প্রবৃদ্ধি নেই। থাকার কথাও নয়—এগুলো মানি।

স্বর্ণের স্বকীয় মূল্য নেই?

যদি কোনো কারেন্সিপূজারি ব্লগার বা রিপোর্টার আপনাকে বলে যে স্বর্ণের স্বকীয় মূল্য (Intrinsic value) নেই। তার কথার সম্পূরক অংশটুকু বলে দেন যে, স্বকীয় মূল্যের ধারণাটা পুরোদস্তুর মার্ক্সিস্ট অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য।

স্বকীয় মূল্যের ধারণা প্রথম উদ্ভাবন করেন ড্যাভিড রিকার্ডো, ১৮১১ সালে। এটি ছিল তার লেবার থিয়োরি অব ভ্যালুর সম্প্রসারণ। পরবর্তী সময়ে কার্ল মার্ক্স ১৮৪৮ সালে দ্য কম্যুনিস্ট মেনিফেস্টোতে এবং তার ডাস ক্যাপিটালে এই থিয়োরি গ্রহণ করে একে জনপ্রিয় করে তুলেন।

এই থিয়োরির মূল কথা হচ্ছে, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ হয় এর পেছনে ব্যয়িত শ্রম ও পুঁজির ভিত্তিতে। যত বেশি শ্রম যাবে, পণ্য তত বেশি মূল্যবান। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সমালোচনা করে মার্ক্স বলেন, বুর্জোয়া পুঁজিবাদীরা উৎপাদনযন্ত্রগুলোর ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে রেখেছে, তারা শ্রমিকদের শ্রমের যথাযথ মূল্য পরিশোধ করে না। অথচ তারা যে পণ্য বিক্রি করে, এর মূল কারিগরই শ্রমিক ও তার শ্রম। শ্রমের বদৌলতেই মূল্যহীন কাঁচামালগুলো বহুমূল্যের পণ্য হয়ে ওঠে।

তার ভাষ্যমতে শ্রমিকরা পারিশ্রমিক যে 'মূল্য' পায়, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ 'মূল্য' সে কাঁচামালে সংযুক্ত করে। অর্থাৎ যতটুকু বেতন পায়, তার চেয়ে ঢের বেশি শ্রম দিতে হয়। এই অতিরিক্ত অংশটুকু হচ্ছে *সারপ্লাস ভ্যালু* বা উদ্‌বৃত্ত মূল্য। এটিই পুঁজিবাদীদের লভ্যাংশ। যত বেশি সারপ্লাস ভ্যালু, তত প্রফিট। অন্যভাবে বললে যত বেশি শ্রমিক শোষণ, তত বেশি লাভ।

উৎপাদনযন্ত্রগুলো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বুর্জোয়া পুঁজিবাদীরা সারপ্লাস ভ্যালু শোষণ করে নেয়। তার থিয়োরিমতে পুঁজিবাদী কর্তৃক এই শ্রমিক শোষণ তীব্র আয়বৈষম্য তৈরি করবে, শোষিত শ্রমিকদের মাঝে শ্রেণিবোধ (সমাজে দুটি শ্রেণি—মালিক ও শ্রমিক। মার্ক্সের ভাষায় বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত) তীব্রতর করে তুলবে। ফলে শোষিত হতে হতে একসময় দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে বুর্জোয়া পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতরা বিদ্রোহ করবে, পুঁজিবাদকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।

মার্ক্সের পুরো গবেষণা প্রক্রিয়া দাঁড়িয়ে আছে স্বকীয় মূল্যের ধারণার ওপর। কিন্তু Intrinsic value বা স্বকীয় মূল্যের ধারণার সমস্যা হলো এটি ১৮৭১ সাল থেকে অর্থনীতিবিদদের সুদৃষ্টিতে নেই। সে বছর ইউনিভার্সিটি অব ভিয়েনার কার্ল মেঞ্জের নতুন এক ধারণার প্রবর্তন করেন—সাবজেক্টিভ ভ্যালু। মেঞ্জারের এই বৈপ্লবিক ধারণা পরবর্তী সময়ে অস্ট্রিয়ান স্কুল অব ইকোনোমিক্সের প্রাণভোমরায় পরিণত হয়।

সাবজেক্টিভ ভ্যালু হচ্ছে সেই ভ্যালু বা মূল্য, যা কোনো ব্যক্তি কোনো পণ্যের ওপর আরোপ করে তার প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে। অর্থাৎ একেকজনের নিকট একেক পণ্য মূল্যবান। প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে সে বস্তুর মূল্যায়ন করে। যেমন কারও নিকট হয়তো একটি ক্যামেরা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সে লাখ টাকা দিয়ে তা ক্রয় করতে রাজি। আরেকজনের নিকট এটি হয়তো পুরোপুরি মূল্যহীন। এমন লোকও পাওয়া যাবে যাকে বিনা মূল্যে দিলেও হয়তো নিতে আগ্রহী হবে না। সাবজেক্টিভ ভ্যালু পুরোপুরি স্বাধীন। স্বকীয় মূল্য বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত শ্রম ও মূল্যের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ধরি একজন স্বর্ণখনির মালিক আদালতে তার দেউলিয়াত্বের ঘোষণা দিয়ে আবেদন করলেন, কারণ তার স্বর্ণ উত্তোলনের খরচ স্বর্ণের বাজারমূল্যের চেয়ে বেড়ে গেছে। এই উদাহরণ থেকে স্বকীয় মূল্যের ধারণার ভ্রান্তি বুঝা যায়। কারণ স্বকীয় মূল্য থাকলে তা কখনোই সুনির্দিষ্ট একটা সীমার নিচে নামত না।

স্বর্ণের কোনো ধরনের বাণিজ্যিক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবহার নেই। এটি শুধু অর্থ বা মানি-ই ব্যবহৃত হতে পারে, অন্যকিছু নয়। গহনাও স্বর্ণের স্বতন্ত্র কোনো ব্যবহার নয়। এটি বাহ্যত আকর্ষণীয় এবং পরিধানকারীকে একধরনের পুলক এনে দেয়। তাও এই কারণে যে স্বর্ণ ‘মূল্য’ প্রকাশ করছে। ফলে দেখা যাচ্ছে গহনাও মানির আরেক রূপ, যে রূপের মাধ্যমে মানুষ ‘মূল্য’ সংরক্ষণ করে থাকে। সাবজেক্টিভ ভ্যালু থিয়োরির আলোকে স্বর্ণের কোনো স্বকীয় মূল্য নেই, এর দাম মানুষের অর্থ চাহিদার ওপর ভিত্তি করে উঠানামা করবে। তারতম্য হবে।

রবিনসন ক্রুসোর চিত্রিত জীবনধারণতুল্য সমাজ ও অর্থনীতির (যে সমাজে সবাই যার যার প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করে) চেয়ে যারা এগিয়ে গেছে, তাদের অবশ্যই কোনো-না-কোনো বিনিময় মাধ্যম বা মানির প্রয়োজন হবে। তা হতে পারে স্বর্ণ, রুপা, টাকা, ডলার, ইউরো বা বিটকয়েন। ক্ষেত্র ও সময়বিশেষে পাখির পালক, ঝিনুকের খোলস বা বিভিন্ন বীজ ও গুটিও অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। এসব 'অর্থের' মূল্য নির্ধারণ হয় সেই সমাজ ও সমাজের প্রতিটা মানুষের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা বিবেচনায়। হতে পারে কোনো সময়ে টাকা বা ডলার খুব মূল্যবান, সেই তুলনায় স্বর্ণ তুলনামূলক মূল্যহীন, কিন্তু ডলারের দরপতন হতে পারে। আবার কখনো সাবজেক্টিভ ভ্যালুর পরিবর্তনের কারণে স্বর্ণের তুলনায় ডলারের দাম কমে যেতে পারে।

ফলে দেখা যাচ্ছে স্বকীয় মূল্যের ধারণাটা একটা সেকেলে ধারণা। আজ থেকে ১৪৫ বছর পূর্বেই মেঞ্জার তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। এখনো যদি কেউ স্বকীয় মূল্য! স্বকীয় মূল্য!—বলে চেঁচায়, বুঝতে হবে সে পুরাতন মার্ক্সিস্ট অর্থনীতির গোঁয়ারগোবিন্দ।

দেখা যাচ্ছে স্বর্ণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই ছয়টি অভিযোগের পাঁচটি অবাস্তব। গবেষণা ও ইতিহাসের আলোকে এগুলো ভ্রান্ত। একটি সঠিক—স্বর্ণের প্রবৃদ্ধি নেই। কিন্তু এটি সমালোচনা নয়; বরং স্বর্ণ অর্থ ব্যবহারযোগ্য সে কথার প্রমাণ। বিশ্বের প্রতিটি অর্থব্যবস্থাই ত্রুটিপূর্ণ, সবগুলোরই কিছু-না-কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড পুনঃপ্রয়োগ করতে গেলে অবশ্যই ব্যাপক-সুবিস্তৃত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে। সুনিপুণভাবে গোল্ড ও কারেন্সির দর নির্ধারণ করতে হবে। বিভিন্ন দেশের কারেন্সির বিনিময় হার নির্ধারণ করতে হবে এবং সেগুলো যথাযথভাবে দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

এই কর্মযজ্ঞ নতুন নয়। ইউরোকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্মিলিত কারেন্সি ঘোষণার পূর্বে একই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। টানা আট বছরের গবেষণার পর ইউরোপের নানা দেশের কারেন্সিকে ১৯৯২ সালে ম্যাস্ট্রিচ চুক্তির মাধ্যমে ইউরোতে রূপান্তর করা হয় এবং ১৯৯৯ সালে অফিশিয়ালি ইউরো চালু করা হয়।

স্বর্ণবিরোধীদের অভিযোগ থাকতে পারে, যদি আদৌ বাস্তব কোনো অভিযোগ থেকে থাকে। কিন্তু উল্লেখ-করা অভিযোগগুলো অবান্তর।

স্বর্ণের পক্ষে

স্বর্ণের বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে এবার আমরা স্বর্ণের স্বপক্ষে কী কী যুক্তি আছে সেগুলো দেখব। কিন্তু বিপক্ষের যুক্তিগুলোর ন্যায় স্বপক্ষেও কিছু হাস্যকর ষড়যন্ত্রতত্ত্ব রয়েছে।

তার একটি হচ্ছে—ফোর্ট নক্সে (আমেরিকার স্বর্ণের গুদাম) কোনো স্বর্ণ মজুত নেই! সত্যি?

বাস্তবতা হচ্ছে আমেরিকার স্বর্ণ কেন্টাকির ফোর্ট নক্স, নিউইয়র্কের ওয়েস্ট পয়েন্টে মজুত রয়েছে। এবং দ্য ডেনভার মিন্ট ও ফেডারেল রিজার্ভেও অল্প পরিমাণ স্বর্ণ মজুত রয়েছে। সুইজারল্যান্ডের বাসেলে অবস্থিত দ্য ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটলমেন্টের মাধ্যমে এই স্বর্ণ অন্যদেরকে লিজ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এর মানে এই নয় যে, এসব স্বর্ণ মার্কিন সরকারের হস্তচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। স্বর্ণ লিজের কাজটা মূলত কাগুজে, এখানে লিজের কাগজপত্র সরবরাহ করা হয়, আসল স্বর্ণ দিয়ে দেওয়া হয় না।

আমাদের এই বইয়ের নাম—*দ্য নিউ কেস ফর গোল্ড*। এখানে আমরা 'নিউ' শব্দটিতে জোর দেবো। পুরাতন যুক্তিই নতুন করে জাবর কাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ২১ শতককে সামনে রেখে আলোচনা এগিয়ে নেওয়া। এখানে রয়েছে সাইবার ফিন্যান্সিয়াল ওয়ারফেয়ার, ইরান বা এরকম অন্য কোনো দেশের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের ক্ষেত্রে স্বর্ণের গুরুত্ব এবং আইএমএফের ইস্যুকৃত বর্তমান বিশ্বমুদ্রা বিবেচিত এসডিআরের মোকাবিলায় স্বর্ণের সমস্যা ও সম্ভাবনা।

* * *

চতুর্থ অধ্যায়

স্বর্ণ এবং ফেডারেল রিজার্ভ

বেকারত্ব, শ্রমিকদের অনিশ্চিত জীবন, আশার মৃত্যু, সঞ্চয়ের সহসা ক্ষয়, অপরদিকে কিছু ব্যক্তি, জুয়াবাজ ও মুনাফাখোরের হঠাৎ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাওয়া—মোটাদাগে এই সবকিছু সৃষ্টি হয় 'স্ট্যান্ডার্ড অব ভ্যালু'র অস্থিরতার কারণে।

—জন মেইনার্ড কেইনস, মনিটরি রিফর্ম (১৯২৪)

ফেডারেল রিজার্ভ কি মরে গেছে?

ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম বলতে বোঝানো হয় আমেরিকার ১২টি আঞ্চলিক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ফেডারেল রিজার্ভ। মরে যাওয়া বলতে বোঝানো হচ্ছে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া। যখন কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দায় আয়ের চেয়ে বেড়ে যায়, যা শোধ করার সামর্থ্য তাদের নেই—সেই অবস্থাকে বলা হয় দেউলিয়াত্ব।

আবার প্রশ্নে ফিরে আসি—ফেডারেল রিজার্ভ কি মরে গেছে?

এই প্রশ্নটা আমি বহুজনকে করেছি। ফেডারেল রিজার্ভের বোর্ড অব গভর্নরসের সদস্য, আঞ্চলিক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট, কেন্দ্রীয় ফেডারেল রিজার্ভের সিনিয়র স্টাফ, এমনকি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরাও রয়েছে এই তালিকায়। আমি যেসব উত্তর পেয়েছি—নো, ইয়েস, হতে পারে, এটা কোন বিষয় না, ইত্যাদি। এই মিশ্র উত্তরের বহর দেখেই বুঝা যাচ্ছে ফেডারেল রিজার্ভ নিয়ে সবাই সমস্যায় আছে। উত্তরগুলো যাচাই করে দেখা যাক।

ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে মনে হতে পারে ফেডারেল রিজার্ভ দেউলিয়া নয়। আমি যখন এই বই লিখছি, তখনকার ব্যালান্স শিট (কোনো প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অর্থনৈতিক আয়ব্যয়ের খতিয়ান) বলছে ফেডের (ফেডারেল রিজার্ভ) সমুদয় সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৪.৪৯ ট্রিলিয়ন, দায়ের পরিমাণ ৪.৪৫ ট্রিলিয়ন। ফলে সমুদয় সম্পত্তি থেকে দায় বাদ দিলে পুঁজি থাকে প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার। এ কথা অনস্বীকার্য ফেডের নানা লিভারেজ থাকে। যা এর আয়ব্যয়ে প্রভাব ফেলে।

শুধু এক পার্সেন্ট লস ফেডের সমুদয় পুঁজি 'নাই' করে দিতে পারে। এটা সবার জানা কথা যে শেয়ার মার্কেটে, বন্ডে এক পার্সেন্ট লস খুবই সাধারণ ঘটনা। ফলে ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী ফেড দেউলিয়া না হলেও, ঝুঁকির মুখে আছে তা সুস্পষ্ট।

এখান থেকে আমরা মার্ক টু মার্কেট (mark to market) কনসেপ্টের ধারণা পাই। মার্ক টু মার্কেটের অর্থ হচ্ছে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ তথ্যমতে বর্তমান মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী সব সম্পদের দাম পুনর্নির্ধারণ করা। ব্রোকাররা এগুলো প্রতিদিনই করে থাকে। যদিও রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে। ব্যাংকগুলোও তাদের ব্যালান্স শিটে মার্ক টু মার্কেট করে থাকে। কিছু সম্পদ বাজারদর অনুযায়ী মার্ক টু মার্কেট করা হয়, কিছু বাদ যায়। তা নির্ভর করে এটি দীর্ঘ মেয়াদি ব্যবসা বা বিনিয়োগ পণ্য কি না তার ওপর।

কিন্তু ফেড মার্ক টু মার্কেট ব্যবহার করে না। প্রশ্ন হচ্ছে কেন করে না? মার্ক টু মার্কেট করলে কি তারা দেউলিয়া প্রমাণিত হবে? চলুন উত্তর খুঁজে দেখা যাক।

স্বল্পমেয়াদি উপকরণ—যেমন ৯৯ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের দাম খুব কমই ওঠানামা করে। ফলে মার্ক টু মার্কেট করলেও এর দামে তেমন হেরফের হবে না। ফেডের দেউলিয়াত্বে এর তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না। কিন্তু ১০ বছর মেয়াদি নোট, ৩০ বছর মেয়াদি বন্ডের হিসাব ভিন্ন। এগুলোর দাম খুবই অস্থিতিশীল। এমনকি সুদের হারে অতি অল্প তারতম্যের ফলেও এগুলোর অস্থিতিশীলতা (একে ডিউরেশন বলা হয়) বৃদ্ধি পায় এবং মার্কেট প্রাইসে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে।

নিউইয়র্ক ফেডের তথ্যমতে তারা ১০ বছর মেয়াদি নোটগুলো নানা প্রোগ্রামের আওতায় কিনে নেয়। শুধু সেসব তথ্য বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় মার্ক টু মার্কেটের ভিত্তিতে ফেডারেল রিজার্ভ বিভিন্ন সময় দেউলিয়া হয়ে যায়। এর সাথে যদি যুক্ত হয় ১০ বছর মেয়াদি নোটগুলোর ওপর প্রদত্ত লভ্যাংশ। তবে তা ফেডকে দেউলিয়া করার জন্য যথেষ্ট।

২০১৩ সালের জানুয়ারির শেষদিকে আমি এক বন্ধুর ডিনারে আমন্ত্রিত ছিলাম। সেখানে ফেডারেল রিজার্ভের বোর্ড অব গভর্নরের সদ্য বিদায়ি একজন সদস্য ছিল। প্রাথমিক কিছু আলাপসালাপের পর আমি সাবেক গভর্নরকে জিজ্ঞেস করলাম—মনে হচ্ছে ফেডারেল রিজার্ভ দেউলিয়া হয়ে গেছে! তিনি কিছুটা হতচকিত হয়ে বললেন, না; তা নয়। আমি বললাম, টেকনিক্যালি যদিও দেউলিয়া নয়, কিন্তু মার্ক টু মার্কেটের ভিত্তিতে নিশ্চয় দেউলিয়া? তিনি বললেন, এই হিসাব এখনো কেউ করেনি। আমি বললাম, আমি করেছি। যেহেতু আমি করেছি, ধরে নেওয়া যায় আমার মতো আরও অনেকেই করেছে।

তার চোখ দেখে মনে হলো তিনি হতাশ। তারপর যে উত্তর এলো—ওকে, হতে পারে। বাট আমরা যদি দেউলিয়া হয়েও থাকি, এতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পুঁজি দরকার হয় না। পৃথিবীজুড়ে বহু সেন্ট্রাল ব্যাংকের কোনো পুঁজি নেই। আমি বললাম, আপনার মত মেনে নিচ্ছি যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর পুঁজি দরকার হয় না। কিন্তু আমার মনে হয় আমেরিকার জনগণ এটি জানতে পারলে চমকে উঠবে যে তাদের ফেডারেল রিজার্ভ দেউলিয়া। এবং এ কথা বিশ্বাস করার পর্যাপ্ত কারণ আছে যে ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফেডের দেউলিয়াত্ব একটি বড়সড় ইস্যু হতে যাচ্ছে।

আমাদের আলাপে মেজবানকে কিছুটা নাখোশ মনে হলো। তাই অধিক 'নিরাপদ' ইস্যুতে চলে গেলাম, যেমন ওয়াইনের স্বাদ কিংবা স্কিইং।

এই পুরো আলাপে প্রায়োগিক কিংবা জটিল টেকনিক্যাল বিষয় বোঝানো আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার মূল ফোকাস একটি বিষয়ের ওপর। তা হলো গোটা ডলার ব্যবস্থা কিংবা ফেডারেল রিজার্ভ, সবকিছু দাঁড়িয়ে আছে একটিমাত্র খুঁটির ওপর; কনফিডেন্স বা জনগণের আস্থা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আত্মবিশ্বাস বা আস্থা ধরে রাখা যাবে ততক্ষণ টাকা ছাপতে বাধা নেই। কিন্তু যখনই এই আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যাবে, কোনো প্রিন্টিং প্রেস আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। সমস্যা হচ্ছে ফেডারেল রিজার্ভ এমআইটি থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পিএইচডি হোল্ডার আর গবেষক দিয়ে এমনভাবে ঠাসা যে মার্কিন জনগণ কী ভাবছে, তাদের আস্থা-বিশ্বাসের কী হাল, সেসব ভাবার সময় নীতিনির্ধারকদের নেই। তারা ডক্টরদের উত্থাপিত মডেল বাছাই করতে করতেই নাস্তানাবুদ।

২০১৫ সালের শুরুতে ম্যানহাটনে আমি আরেকজন ফেডারেল কর্মকর্তার সাথে ডিনারে গিয়েছিলাম। যদিও সে গভর্নর নয়; বরং পুরোদস্তুর অ্যাকাডেমিক। ফেডারেল হেডকোয়ার্টারে জাঁকানো অফিসসমেত নীতিনির্ধারক। বেন বেরনাঙ্ক এবং জ্যানেট ইয়েলেন তাকে ফেডের পলিসি কম্যুনিকেশনের জন্য বাছাই করেছিল।

তার সাথেও আমি মার্ক টু মার্কেট ভিত্তিতে ফেডের দেউলিয়াত্বের বিষয়টা তুললাম। যদিও তখন লভ্যাংশের হার কমিয়ে দিয়ে ফেডারেল রিজার্ভ তার দেউলিয়াত্ব আপাতদৃষ্টিতে কাটিয়ে উঠেছে এবং তুলনামূলক ভালো অবস্থানে ছিল। তবুও আমি বিষয়টা তুললাম কারণ যেকোনো সময় সুদহার বর্ধিত হতে পারে, সে ক্ষেত্রে নতুন করে ফেডের মূল্যহ্রাস পাবে। তবে আমার আগ্রহের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে—কনফিডেন্স।

এবারের উত্তর আগেরবারের চেয়ে ঘোলাটে ছিল। তার ভাষ্যমতে—আমরা দেউলিয়া নই, কখনো ছিলামও না। ব্যালান্স শিটে সবকিছু আছে, চাইলে দেখে নিতে পারেন।

তার কনফিডেন্স দেখে আমি চমকে গেলাম। আমি বরং ভাবনায় পড়ে গেলাম ব্যালান্স শিটে আমি কি কিছু মিস করেছি? ফেডের কি কোনো গোপন আলাদিনের চেরাগ আছে?

আমি পুনরায় ব্যালান্স শিট চেক করতে বসে গেলাম। পূর্বে আমি যা মিস করে গিয়েছিলাম, দেখলাম প্রথম লাইনেই তা জ্বলজ্বল করছে—গোল্ড সার্টিফিকেট অ্যাকাউন্ট! ব্যালান্স শিটে এই অ্যাকাউন্টের পরিমাণ লেখা ১১ বিলিয়ন ডলার।

গোল্ড সার্টিফিকেট অ্যাকাউন্ট কী তা বুঝতে হলে আমাদের একটু পেছন থেকে ঘুরে আসতে হবে। ১৯১৩ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত। ১৯১৩ সালে যখন ফেডারেল রিজার্ভ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এর প্রাইভেট অংশীদার প্রতিটি ডিস্ট্রিকের ব্যাংকগুলোকে তাদের হাতে থাকা স্বর্ণ কোনো আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংককে হস্তান্তর করতে বলা হয়। এটি ছিল দেশের সমুদয় স্বর্ণ স্বল্পকিছু হাতে সীমাবদ্ধ করে ফেলার প্রথম পদক্ষেপ। এ নিয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। ১৯৩৪ সালে সরকার ফেডের হাতে থাকা সব স্বর্ণ বাজেয়াপ্ত করে সেগুলো মার্কিন ট্রেজারির হাতে সমর্পণ করে দেয়। ১৯৩৭ সালে ফোর্ট নক্স প্রতিষ্ঠা করা হয়, অংশত ফেড থেকে আনা স্বর্ণ রাখার জন্য এবং অংশত মার্কিন জনগণ থেকে ১৯৩৩ সালে বাজেয়াপ্ত করা স্বর্ণ রাখার জন্য।

কিন্তু এখানে একটি সমস্যা দেখা দেয়। মার্কিন সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে বলা আছে যথাযথ ক্ষতিপূরণ ছাড়া সরকার জনগণের কোনো সম্পদ হস্তগত করতে পারবে না। তাই সান্ত্বনা মার্কিন ট্রেজারি ফেডারেল রিজার্ভকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করে। এটিই গোল্ড সার্টিফিকেট অ্যাকাউন্ট। এতে দুটি কাজ হয়। প্রথমত ফেডের ব্যালান্স শিটে গোল্ড সার্টিফিকেট অ্যাকাউন্ট উল্লেখ করা যায়। পাশাপাশি সার্টিফিকেটের মাধ্যমে 'যথাযথ ক্ষতিপূরণও' আদায় হয়ে যায়!

এই গোল্ড সার্টিফিকেটের সর্বশেষ মার্ক টু মার্কেট করা হয়েছিল ১৯৭১ সালে। প্রতিআউন্স ৪২.২২২২ ডলার দাম ধরে। ব্যালেন্স শিট অনুসারে সেই স্বর্ণের পরিমাণ ছিল ২৬১.৪ মিলিয়ন আউন্স বা ৮ হাজার টন! ব্যালান্স শিটে এখনো ১৯৭১ সালের দামই উল্লেখিত আছে। মাত্র ১১ বিলিয়ন। কিন্তু এই সমুদয় স্বর্ণকে যদি বাজারদর অনুযায়ী মার্ক টু মার্কেট করা হয় তবে এর দাম বহুগুণ বেড়ে যায়। বর্তমানে প্রতিআউন্স স্বর্ণের দাম ১২ শ ডলার। সে ৮ হাজার টন স্বর্ণের দাম আসে ৩১৫ বিলিয়ন ডলার। ব্যালান্স শিটে আছে ১১ বিলিয়ন, বর্তমান বাজারদরে মূল্য

আসে ৩১৫ বিলিয়ন! এখানেই তো ফেডের আয় বেড়ে যাচ্ছে ৩০০ বিলিয়নের বেশি। এটিই সেই গবেষকের কনফিডেন্সের গোপন সূত্র এবং ফেডের লুক্কায়িত সম্পদ। বন্ডের ওপর প্রদত্ত লসের পরও মার্ক টু মার্কেট ভিত্তিতে ফেডের ঘাটতি কাটিয়ে উঠার জন্য এই সম্পদ যথেষ্টর চেয়েও বেশি।

মজার বিষয় হচ্ছে ফেডের ব্যালান্স শিট অনুযায়ী তাদের আছে ৮ হাজার টন স্বর্ণ, ওদিকে মার্কিন ট্রেজারিতে স্বর্ণের পরিমাণও ৮ হাজার টন। ১৯৫০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে স্বর্ণ ছিল ২০ হাজার টন যা ১৯৮০ সালে কমে মাত্র ৮ হাজার টনে এসে দাঁড়ায়। ১২ হাজার টন স্বর্ণ দুই ধাপে কমেছে।

প্রথমত ১১ হাজার টন গিয়েছে ১৯৫০-১৯৭১ পর্যন্ত বিদেশি বাণিজ্য সহযোগীদের দায়শোধ করতে। আর ১ হাজার টন ১৯৭১-১৯৮০ সাল পর্যন্ত বাজার নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের পেছনে ব্যয় হয়েছে।

বাস্তবে ফেডের হাতে যে গোল্ড সার্টিফিকেট আছে, এটি দিয়ে সে ট্রেজারি থেকে প্রকৃত স্বর্ণ তুলে নিতে পারবে না। বরং পুরো খেলাটাই হচ্ছে—কনফিডেন্সের। যদি কখনো ফেডারেল রিজার্ভের ছাপানো টাকার ওপর জনগণের আস্থা হারিয়ে যায়, তবে ট্রেজারি স্বর্ণ দিয়ে সেই আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবে। ট্রেজারির হাতে থাকা স্বর্ণ দিয়ে ফেডের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনার এই প্রক্রিয়ার আরেক নাম—গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড!

মাই ফ্রেন্ড, লক্ষ করুন। এটিই আমাদের আলোচনার মূল পয়েন্ট। বাহ্যত যদিও ২০১৩ সালের ব্যালান্স শিট অনুযায়ী মনে হয়েছিল ফেড দেউলিয়া। কিন্তু তার গোপন সম্পদের কারণে সে মূলত দেউলিয়া নয়। কী সেই গোপন সম্পদ? স্বর্ণ! গোটা বিশ্বের অর্থব্যবস্থার কনফিডেন্স দাঁড়িয়ে আছে ডলারের ওপর। ডলারের কারিশমা দাঁড়িয়ে আছে ফেডের ব্যালান্স শিটের দেউলিয়াত্ব আর অ-দেউলিয়াত্বের ওপর। ফেডের দেউলিয়াত্ব নির্ভর করে আছে কীসের ওপর? স্বর্ণের ওপর! কিন্তু এই বিষয়টা ফেড স্বীকার করতে চায় না কিংবা জনসম্মুখে আলোচনা করতেও ইচ্ছুক না। এমনকি মার্কিন সরকার ১৯৭১ সালের পর তার হাতে থাকা স্বর্ণের অডিটও করতে দেয় না। ফলে বাজারে ষড়যন্ত্রতত্ত্ব ছড়িয়েছে যে সরকারের হাতে কোনো স্বর্ণ নেই।

সরকার চায় জনগণ যেন স্বর্ণের কথা ভুলে যায়। স্বর্ণকে খুব বেশি গুরুত্ব না দেয়। কারণ এর সাথে ডলারের ওপর জনগণের কনফিডেন্সের বিষয় জড়িত। যদি একবার ডলারের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের দাবি ওঠে, তবে শুধু মার্কিন ডলার নয়, গোটা বিশ্বের অর্থনীতি তছনছ হয়ে যাবে।

যা-ই হোক, অফিশিয়ালি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড না থাকলেও স্বর্ণ এখনো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখতে পেলাম আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে স্বর্ণের ওপর, যদিও তা গোপন স্বর্ণ। এই কারণেই অর্থব্যবস্থায় সরকারগুলো জনসম্মুখে স্বর্ণের ভূমিকা অস্বীকার করলেও সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক উভয়েই ভল্ট ভরে রাখে স্বর্ণ দিয়ে।

বাংলাদেশের অর্থ সরবরাহ ব্যবস্থা

অর্থ সরবরাহ বা মানি সাপ্লাই বলতে বোঝানো হয় একটি দেশের অভ্যন্তরে থাকা সমুদয় নগদ অর্থ। দেশে কী পরিমাণ অর্থ আছে তা পরিমাপ করার একাধিক পন্থা আছে। একেক দেশে একেক পরিমাপ-পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। তবে সাধারণত বিশ্বব্যাপী মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের প্রবর্তিত পদ্ধতিগুলো জনপ্রিয়। এগুলোকে 'এম' (M) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন : এম জিরো, এম ওয়ান, এম টু এবং এম থ্রি (M0, M1, M2, M3)। দেশভেদে এটিও পরিবর্তন হয়। সাধারণত এম জিরো বলতে বোঝানো হয় ন্যারো মানি বা শুধু কয়েন ও কাগুজে নোট। এম ওয়ান বলতে বোঝানো হয় এম জিরো প্লাস স্বল্পমেয়াদি ডিপোজিটসমূহ। এম টুতে এম ওয়ান প্লাস দীর্ঘমেয়াদি ডিপোজিট। এভাবেই চলে। বাংলাদেশ ব্যাংক (BB) সাধারণত M1 এবং M2 ব্যবহার করে থাকে।

বাংলাদেশের বাজারে টাকা ছাড়ে দুটি প্রতিষ্ঠান। অর্থমন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক। অর্থমন্ত্রণালয় যেসব নোট ছাড়ে সেগুলোকে বলা হয় সরকারি নোট। এই নোটে অর্থসচিবের স্বাক্ষর থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেসব নোট ছাড়ে সেগুলোকে বলা হয় ব্যাংক নোট। এতে বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে।

২০১৫ সালের পূর্বে বাংলাদেশে সরকারি নোট ছিল এক টাকা এবং দুই টাকার কয়েন ও নোট। এগুলোতে অর্থসচিবের স্বাক্ষর আছে। ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট হচ্ছে ব্যাংক নোট, এগুলো গভর্নর কর্তৃক স্বাক্ষরিত। বাকি থাকে পাঁচ টাকার নোট। আগে এটি ব্যাংক নোট ছিল। কিন্তু ২০১৫ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ কয়েনেজ আইন সংশোধন করে একে সরকারি নোটে পরিণত করা হয়।

স্বর্ণের বিষয়টা দেখাভাল করে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক স্বর্ণ মজুত রাখে দুটি খাতে। একটি হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ খাত। অপরটি অস্থায়ী খাত। দেশে অবৈধভাবে বিদেশ থেকে যেসব স্বর্ণ আসে, সেগুলো ধরা পড়লে মামলার আলামত বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে রাখা হয়। মামলা শেষে যদি স্বর্ণের মালিকানা যথাযথভাবে প্রমাণ করতে পারে তবে তা মালিকের হাতে ন্যস্ত করে দেওয়া হয়। অন্যথায় বাংলাদেশ ব্যাংক তা নিলামে বিক্রি করে দিয়ে বিক্রিলব্ধ টাকা কাস্টমস

কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়। কখনো কখনো কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজেই এই স্বর্ণ কিনে নিয়ে তা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে স্থায়ী স্বর্ণ রেখে দেয়।

ব্যাংকের স্বর্ণের মজুত হ্রাসবৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি নানা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে স্বর্ণ মজুত রাখে। আমেরিকার সেন্ট্রাল ফেডারেল রিজার্ভ ১২টি আঞ্চলিক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের সমন্বয়ে গঠিত। নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক সেই ১২টি আঞ্চলিক রিজার্ভের একটি।[১]

* * *

[১] The Money Supply Process in Bangladesh: An Econometric Analysis, Global Disclosure of Economics and Business, Volume 4, No 2/2015

পঞ্চম অধ্যায়

গোল্ড ইজ মানি (স্বর্ণই অর্থ)

মানুষ স্বর্ণে বিমোহিত। স্বর্ণের চাকচিক্যের জন্য নয়; বরং এজন্য যে স্বর্ণ হচ্ছে অর্থ। এই বিষয়টি দিয়ে আমাদের স্বর্ণের বোঝাপড়া শুরু হবে। পৃথিবীতে নানা সময়ে নানা ধরনের অর্থ প্রচলিত ছিল। সেগুলো বৈশ্বিক রিজার্ভ মানি হওয়ার জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতাও করেছে। বর্তমানে ডলার, ইউরো এবং বিটকয়েন—সবগুলোই অর্থের নানা রূপ। স্বর্ণও।

অর্থ কী?

অর্থের ক্ল্যাসিক্যাল সংজ্ঞার তিনটি মূল অংশ রয়েছে; বিনিময় মাধ্যম, মূল্য সংরক্ষক এবং মূল্য পরিমাপক। অর্থ বিবেচিত হওয়ার জন্য এই তিনটি মানদণ্ডেই উত্তীর্ণ হতে হবে। মূল্য পরিমাপক বলতে বোঝায় এর দ্বারা যেকোনো পণ্যের মূল্যায়ন করা সম্ভব। যেমন টাকা। আপনি খাট কিনতে যাবেন? গরু? শাকসবজি? কাপড়? গাড়ি? পানি? মাছ? সবকিছুকে টাকায় মূল্যায়ন করে এর দাম বের করতে পারবেন। কিন্তু যদি বলা হয় চাল দিয়ে এগুলোর মূল্য পরিমাপ করতে? পারবেন না। সে ক্ষেত্রে আবার টাকাকেই মাধ্যম নিতে হবে। চালের মূল্য টাকায় কনভার্ট করে তারপর সেখান থেকে মূল্য বের করতে হবে।

অবশ্য যদি কোনো অর্থনীতিবিদকে জিজ্ঞেস করেন তবে সে নির্ঘাত বলবে অর্থ হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ছাপানো বিহিত মুদ্রা (বিহিত মুদ্রা বলা হয় যা কোনো দেশের সরকারের আদেশে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন বাংলাদেশের টাকা, ভারতের রুপি, ইত্যাদি)। তারপর চলে যাবে অর্থের প্রকার কয়টি ও কী কী। ন্যারো মানি ও ব্রড মানির প্রকার বোঝাতে শুরু করবে।

এম দিয়ে কীভাবে অর্থের পরিমাপ করা হয় সেগুলোও চলে আসবে হয়তো। M0 হচ্ছে সবচেয়ে সংকীর্ণ (বা অর্থের সবচেয়ে খাঁটি রূপ)। এটি দ্বারা শুধু নগদ অর্থ এবং ব্যাংক রিজার্ভ বোঝানো হয়। এম জিরোকে বেজ মানি বা ভিত্তিমূল্যও বলা হয়, কারণ এটিই অর্থের সবচেয়ে সংকীর্ণ রূপ।

আমি বলি স্বর্ণ হচ্ছে বরং সাব-জিরো (আধা জিরো বা জিরোর চেয়েও সংকীর্ণ)। কারণ অর্থনীতিবিদরা স্বীকার না করলেও অর্থের প্রকৃত ভিত্তি স্বর্ণই। পেপার কারেন্সি সরবরাহ স্বর্ণের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে।

স্বর্ণই কেন?

স্বর্ণবিরোধীরা হয়তো লাফ দিয়ে বলে বসবে, আরে! এটি চকচকে ধাতু বৈ কিছু নয়। তাদের কথায় মনে হবে স্বর্ণের কোনো অর্থমূল্য নেই। যদি তাই হয়; তবে কেন ফেডারেল রিজার্ভের সাবেক চেয়ারম্যান বেন বেরনাঙ্কের মতো কাটখোট্টা অর্থনীতিবিদও মার্কিন স্বর্ণের রিজার্ভ স্বল্পতা নিয়ে চিন্তিত? আসল কথা হচ্ছে অর্থ স্বর্ণের ব্যবহার শুধু অতীতের বিষয় নয়; বরং বর্তমানেও এটি একটি ব্যাবহারিক বাস্তবতা।

অতি সম্প্রতি বিবিসি ওয়ার্ল্ডের জাস্টিন র‍্যালেট ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক এ্যান্ড্রে সেলার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। সেখানে তিনি ইতিহাসের সময়কাল ধরে ধরে দেখিয়েছেন কেন আমাদের চেনাজানা বিশ্বের বাকিসব ধাতুর মধ্য থেকে অর্থ হিসেবে স্বর্ণই টিকে রইল। তিনি পিরিওডিক ট্যাবল অব ইলিম্যান্টের একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা পেশ করেছেন। এবং ব্যাখ্যা করেছেন কেন শুধু স্বর্ণ আদর্শ মুদ্রা ব্যবহারযোগ্য। আমাদের হাইস্কুলে পড়ে আসা পিরিওডিক ট্যাবল অব ইলিম্যান্টের বিষয়টা মনে থাকার কথা। যেখানে ১১৮টি পদার্থের নাম ও কার্যক্ষমতার বিবরণ দেওয়া আছে। আমাদের চেনাজানা বিশ্বের সবকিছুই এই পদার্থের যেকোনো একটা বা কয়েকটার সমন্বয়ে সৃষ্ট।

রিভিউতে তিনি দেখিয়েছেন এসব পদার্থের কোনোটিই অর্থ বা মানি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য নয়। তবে একটা শুধু ব্যতিক্রম, এটি প্রায় নিখুঁত মুদ্রাতুল্য—গোল্ড! এ ছাড়া বাকিগুলোর কিছু হচ্ছে গ্যাস, যেমন হিলিয়াম। কিছু আছে লিকুইড বা তরল যেমন পারদ। আর্সেনিকের মতো কিছু পদার্থ এমনিতেই বাতিলের খাতায়, কারণ এগুলো বিষাক্ত। সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম পানির সংস্পর্শে গেলে বিস্ফোরিত হয়। বর্ষাকালের জন্য সঞ্চিত টাকা বিস্ফোরিত হয়ে মৃত্যু নিশ্চয় সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। রেডিওএ্যাক্টিভ পদার্থগুলোও টাকা ব্যবহারযোগ্য না, যেমন ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম। কেউ নিশ্চয় এমন টাকা পকেটে নিয়ে ঘুরতে রাজি হবে না যা ক্যান্সারের কারণ হবে। লোহা, তামার মতো জং ধরে যায় এমন পদার্থগুলোও অর্থ বিবেচ্য নয়। কারণ রেখে দিলে এগুলো এমনিতেই নষ্ট হয়ে যাবে। সেন্ট্রাল ব্যাংকে আপনি চকচকে টাকা রাখলেন, ১০ বছর পর তুলতে গিয়ে দেখলেন মরিচা ধরে সেগুলো অর্ধেক খেয়ে গেছে। সুখকর অভিজ্ঞতা নয়।

বাতিলের তালিকার পরে শুধু আটটি পদার্থ থাকে, তথাকথিত নোবল মেটালস। এগুলোর মধ্য থেকে শুধু রুপা আর স্বর্ণই পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যায়। বাকিগুলো দুর্লভ। খুবই দুর্লভ। ফলে বাস্তবে অর্থ ব্যবহার করার জন্য স্বর্ণ-রুপা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

তিনি তার পর্যালোচনার পরিসমাপ্তি টানেন এভাবে—

> শেষমেশ শুধু দুটি পদার্থ বাকি থাকে—স্বর্ণ ও রুপা। দুটিই স্বল্প; তবে বিরল নয়। উভয়ের গলনাঙ্ক তুলনামূলক কম। ফলে এগুলোকে কয়েন ও অলংকারে রূপান্তর করা সম্ভব। তবে রুপায় মরিচা ধরে। বাতাসের সংস্পর্শে এটি খুব হালকা পরিমাণে সালফার নিঃসরণ করে। ফলে বাধ্য হয়ে আমরা স্বর্ণকে বিশেষ মূল্যায়ন করতে হচ্ছে।

এ ছাড়াও স্বর্ণের আরও একটি আকর্ষণ রয়েছে—এর স্বর্ণলি দ্যুতি। বাকি সব পদার্থ রুপালি বর্ণ, শুধু তামা ছাড়া। এটিও বাতাস লাগলে সবুজাভ হয়ে যায়। যদিও অর্থ হওয়ার জন্য রং বিবেচ্য নয়।

আমাদের পূর্বসূরিরা শুধু চাকচিক্য কিংবা সৌন্দর্যের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করতেন না, যেমনটা অনেক সমালোচকের বক্তব্য। বরং স্বর্ণ সেই সমস্ত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ যেগুলো বাস্তব পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য প্রয়োজন—স্বল্পতা, নমনীয়তা, টেকসই ও অভিন্নতা। তারা আমাদের চেয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। কী করছেন সে বিষয়ে তারা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। যদিও এসব গুণাগুণ থাকার মানে এই নয় যে এটি অর্থ হিসেবে ব্যবহৃত হতেই হবে।

বর্তমানে বেশিরভাগ অর্থই ডিজিটাল। ইলেক্ট্রোনে সংরক্ষিত সংখ্যা। নিছক সংখ্যা। এগুলোতেও মরিচা ধরে না। তবে এগুলো স্বল্প বা অপ্রতুল নয়। যতখুশি সংখ্যা বসানো যাবে (অপ্রতুলতা অর্থের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য)। অর্থ ডিজিটাল বলেই এর বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই এ কথা ভাবার সুযোগ নেই। যতই ডিজিটাল হোক, সেই পিরিওডিক ট্যাবল অব ইলিমেন্ট থেকে মুক্তি নেই। কারণ সিলিকন চিপে সংরক্ষিত সংখ্যা হ্যাক হতে পারে, অনায়াসেই মুছে দেওয়া যেতে পারে। হ্যাকার হ্যাক করে সংখ্যাটা মুছে দিলো, আর হারিয়ে গেল ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন অর্থ! পক্ষান্তরে স্বর্ণ 'হ্যাক' করা যায় না। চাইনিজ কিংবা রাশিয়ান হ্যাকাররা আক্রমণ চালিয়ে ভ্যানিশ করে দিতে পারবে না। তাই আধুনিক ডিজিটাল যুগেও স্বর্ণ আপন মহিমায় ভাস্বর।

স্বর্ণ বিনিয়োগ নয়

স্বর্ণ বিনিয়োগ নয়। কারণ এতে কোনো রিস্ক নেই, ফলে প্রবৃদ্ধিও নেই। ওয়ারেন বাফেট স্বর্ণের সমালোচনা করতে গিয়ে বলে থাকে যে এর প্রবৃদ্ধি নেই। তার কথা সঠিক। এই বিষয়টা আমরা পূর্বে দেখেছি। যদি আপনি এক আউন্স স্বর্ণ ক্রয় করে রেখে দেন। ১০ বছর পর এটি যেমন রেখেছেন তেমনই থাকবে। বাড়বে না, কমবেও না। হ্যাঁ, এই ১০ বছরে টাকার হিসেবে স্বর্ণের মূল্যে ব্যাপক তারতম্য হতে পারে। এটা স্বর্ণের সমস্যা নয়, টাকার সমস্যা।

বিনিয়োগ থেকে প্রবৃদ্ধি পেতে হলে আপনাকে রিস্ক নিতে হবে, স্বর্ণে রিস্ক কোথায়? স্বর্ণ স্বর্ণই। আপনি স্বর্ণের মালিক হয়েছেন মানে স্বর্ণেরই মালিক হয়েছেন। অন্য কেউ এর দায় নিতে হবে না, ইনস্যুরেন্স দিতে হবে না। আপনি যদি ভুট্টা কিনতে যান, ভাবতে হবে ভেতরে পোকা নেই তো! তেল কিনতে গেলে তো মাথাই নষ্ট হওয়ার উপক্রম হবে। বিশ্বজুড়ে তেলের পঁচাত্তরটি গ্রেড আছে। কোনটি কিনবেন? কিন্তু স্বর্ণ? শুধুই স্বর্ণ। এ্যাটমিক নাম্বার ৭৯। সর্বদাই খাঁটি স্বর্ণ।

স্বর্ণ পণ্য নয়

স্বর্ণের বলতে গেলে কোনো ধরনের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবহার নেই। কারণ এটি কোনো কিছুর কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। বাকি ধাতবগুলোর অবস্থা দেখুন—তামা তার ও পাইপ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। রুপা মূল্যবান ধাতু হওয়া সত্ত্বেও বহু সেক্টরে ব্যবহৃত হয়। বলা চলে বাকি সব ধাতুরই ম্যানুফ্যাকচার এবং প্রোডাকশনের কাঁচামাল ব্যবহার আছে, শুধু স্বর্ণের নেই। তবে ইলেক্ট্রনিকসে স্বর্ণের কিছু ব্যবহার আছে, কাঁচামাল হিসেবে নয়; বরং লেপন ও জোড়া দেওয়ার কাজে।

অবশ্য আমার ধারণা স্বর্ণ পণ্য নয়—এ কথা শুনে আপনি ভ্রু কুঁচকাচ্ছেন। কারণ আপনার ফেভারিট ওয়েবসাইটগুলোতে নিশ্চয় পণ্যের তালিকায় স্বর্ণের নাম আছে। সেখানে হয়তো দামের ওঠানামার ডেইলি আপডেটও পাচ্ছেন। কিন্তু এসব সাইটের পণ্য তালিকায় নাম আসার ফলে স্বর্ণ বাস্তবে পণ্যে পরিণত হয়ে যায়নি। ইনভেস্টরদের এই বিষয়টা বোঝা বেশ জরুরি। কারণ এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো অন্যান্য পণ্যের দামে প্রভাব ফেলে, কিন্তু স্বর্ণের মূল্য তেমন প্রভাবিত করে না, বা করতে পারে না।

বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট গ্রেট ডিপ্রেশন থেকে উদাহরণ দেওয়া যাক। সে সময় সব ধরনের পণ্য এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টের দাম হুহু করে পড়ছিল। কিন্তু ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত মার্কিন ডলারের বিপরীতে স্বর্ণের দাম

পড়েনি। পুরো সময়টাজুড়ে আউন্সপ্রতি ২০.৬৭ ডলারে স্থির ছিল। এ সময় স্বর্ণ পণ্যের ভূমিকা পালন করেনি, অর্থের ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৩৩ সালের এপ্রিলে সরকার মূল্যহ্রাস (ডিফ্ল্যাশন) নিয়ন্ত্রণে মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা মুদ্রাস্ফীতি (ইনফ্ল্যাশন) চাচ্ছিল। চাচ্ছিল জিনিসপত্রের দাম যেন বাড়ে। সরকার স্বর্ণের দাম ২০.৬৭ ডলার থেকে বাড়িয়ে ৩৫.০০ ডলার করে দেয়। স্বর্ণের দাম বাড়ানোর পর কয়েক মাসেই স্টক মার্কেট এবং পণ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করে। এ সময়েও স্বর্ণ পণ্যের দায়িত্ব পালন করেনি, অর্থের করেছে। এবং এখনো সরকার ও সেন্ট্রাল ব্যাংকগুলো ডিফ্ল্যাশনের ভয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে স্বর্ণই তাদের ত্রাতা। সেন্ট্রাল ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতিতে ব্যর্থ হলে স্বর্ণের শরণ গ্রহণ করে।

স্বর্ণ অর্থের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে কন্টিনিউয়াস কমোডিটি ইনডেক্স, ২০১৪। এই ইনডেক্সে স্বর্ণ, লৌহ আকরিক, তামা, অ্যালুমিনিয়াম এবং কৃষিপণ্য-সহ মোট ১৬টি পণ্য আছে। জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত স্বর্ণের দাম স্থিতিশীলই ছিল, যেমনটা হওয়ার কথা। কিন্তু নভেম্বরে এসে একদিকে ইনডেক্স ডুবে যায় কিন্তু অপরদিকে ডলারের বিপরীতে স্বর্ণের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করে। এই বৈপরিত্যের সাথে আরও যুক্ত হয়েছিল চীন ও রাশিয়ার স্বর্ণের চাহিদা। এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি 'পণ্য' তালিকায় থাকা স্বর্ণ সহসাই পণ্যাচরণ ছেড়ে 'অর্থ' বনে গেছে। ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে, এই ঘটনা তার নজির।

স্বর্ণ কাগজ নয়

লন্ডনের আন্তর্জাতিক স্বর্ণবাজার 'লন্ডন বুলিয়ন মার্কেট অ্যাসোসিয়েশন' (এলবিএমএ) এমন অনেক স্বর্ণ 'তৈরি' করেছে, যা আদতে স্বর্ণ নয়। কাগুজে স্বর্ণ বা নিছক সংখ্যা! এসব কাগুজে স্বর্ণের একটি হচ্ছে ইটিএফ বা এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ডস (এর গোল্ড শেয়ারের নাম জিএলডি)। ইটিএফ হচ্ছে স্টক শেয়ার। কর্তৃপক্ষ হয়তো কোথাও স্বর্ণ রেখেছে, সেই স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে। তবে আপনি যতই কিনেন না কেন, স্বর্ণ হাতে পাবেন না। পাবেন শেয়ার। সেটাও কি বাস্তবে? না। বরং ডিজিটাল সংখ্যা, চাইলেই হ্যাকাররা যা মুছে দিতে পারে বা ছিনিয়ে নিতে পারে। লন্ডনে এলবিএমএ'র ভল্টে স্বর্ণ রাখা আছে। ওয়াল স্ট্রিটের স্পন্সররা, মার্কিন ব্যাংকগুলো এবং আরও বড় বড় ক্লায়েন্টরা এখানে স্বর্ণ কেনাবেচা করে। লাভ তুলে নেয়।

সিস্টেমটা ১৯১৪ সাল নাগাদ লন্ডন আর নিউইয়র্কের মাঝে চলমান গোল্ড পয়েন্টের মতোই অনেকটা। তবে পার্থক্য হচ্ছে এখন স্বর্ণ জাহাজ ভরে আটলান্টিক পাড়ি দিতে হয় না। স্বর্ণের জায়গায় স্বর্ণ আছে, মাঝখানে শুধু মুনাফাখোরি।

যারা এখানে বিনিয়োগ করছে তাদের একাধিক রিস্ক নিতে হচ্ছে। একে তো সরাসরি স্বর্ণ হাতে আসবে না, আছে হ্যাকিংয়ের ভয়। সাথে আছে স্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়। সিম্পল। যদি নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ করে দেওয়া হয়; তবে বিনিয়োগকারীরা তাদের শেয়ার বিক্রি করতে সক্ষম হবে না। অনেকে তর্ক জুড়ে দিতে পারে যে স্টক এক্সচেঞ্জ কখনোই বন্ধ হবে না। তাদের অবগতির জন্য বলছি ইতিমধ্যেই স্টক এক্সচেঞ্জ বহুবার বন্ধ হয়েছে। ২০১৫ সালের জুলাইতে সফটওয়্যার বিভ্রাটের কারণে বন্ধ ছিল। ২০১২ সালে বন্ধ ছিল হ্যারিকেন স্যান্ডির তাণ্ডবে। নাইন-ইলেভেনের পরও বন্ধ ছিল।

সবচেয়ে দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর। সে সময় টানা চার মাস এটি বন্ধ ছিল। বিদ্যুৎ বিভ্রাট কিংবা ইলেক্ট্রনিক প্রব্লেমের কারণে যেকোনো মুহূর্তে বন্ধ হতে পারে। সার কথা হচ্ছে আপনার 'মালিকানায়' থাকা ইটিএফ আদতে একটি সংখ্যা বৈ কিছুই নয়, যা তাদের ডিজিটাল সিস্টেমের হাতে বন্দি।

দ্য লন্ডন বুলিয়ন মার্কেট অ্যাসোসিয়েশন এই ডিজিটাল 'স্বর্ণ' ছাড়া 'কাগুজে স্বর্ণও' বিক্রি করে। লেনদেন কাগজে সম্পন্ন হয়। আপনাকে 'চুক্তিপত্র' দেওয়া হবে, কিন্তু 'চুক্তিপণ্য' পাবেন না। এই স্বর্ণ আন—অ্যালোক্যাটেড বা অবণ্টিত পরিচিত। যার অর্থ হচ্ছে ক্রেতার কাগজই সার, সে কখনোই বাস্তব স্বর্ণ দাবি করতে পারবে না। পক্ষান্তরে বিক্রেতার হাতে হয়তো কিছু স্বর্ণ আছে কিন্তু সেগুলো তার ক্রেতাদের দাবি মেটানোর মতো পর্যাপ্ত নয়। প্রতি এক ডলার সমপরিমাণ স্বর্ণের বিপরীতে ব্যাংক ১০ ডলার বা আরও বেশি পরিমাণ স্বর্ণ বিক্রি করতে পারে। তাদের যুক্তি হচ্ছে সব ক্রেতা তো আর একসঙ্গে স্বর্ণ চাইতে আসবে না। আর চাইলেও তো পাচ্ছে না।

যদি কোনো ক্রেতা আন-অ্যালোক্যাটেড স্বর্ণ থেকে তার চুক্তি অ্যালোক্যাটেড স্বর্ণে কনভার্ট করতে চায়, তবে সে ব্যাংকে নির্দিষ্ট সময় পূর্বে নোটিশ দিতে হবে। এই সময়ের ভেতর ব্যাংক কিছু স্বর্ণ দেখিয়ে চুক্তি কনভার্ট করে দেবে। যদি বহু ক্রেতা একসঙ্গে চুক্তি কনভার্ট করতে চায়? সবাই একসঙ্গে বাস্তব স্বর্ণ চায়? তবে ব্যাংক সবগুলো চুক্তি বাতিল করে দিতে পারবে। যেদিন চুক্তি বাতিল হবে সেদিনের ক্লোজিং প্রাইসে (লেনদেন বন্ধ হওয়ার পূর্বে দিনের সর্বশেষ মূল্য) সব চুক্তি বাতিল করে দেবে। ক্রেতাদেরকে ক্লোজিং প্রাইসের একটা করে চেক ধরিয়ে দেওয়া হবে। এটিই স্বর্ণ! তাও এটি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো পরিস্থিতি। পরিস্থিতি খারাপ হলে ব্যাংক স্বর্ণ প্রদানে ব্যর্থ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ক্রেতারা পাবে—নাথিং।

ফলে দেখা যাচ্ছে এসব কাগজ যদিও স্বর্ণের দামে বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব স্বর্ণ বহুদূর। যদি 'ডিমান্ড শক' (উল্লিখিত পরিস্থিতি) দেখা দেয়, কিংবা স্বর্ণ কেনার হিড়িকের ফলে মূল্য আকাশচুম্বি হয়ে যায়, এই কাগজগুলো মূল্যহীন হয়ে যাবে।

কারণ সবার দাবি মেটানোর মতো স্বর্ণ নেই। তাহলে খাঁটি স্বর্ণ কোনটা? ব্যাংকের বাইরে রাখা স্বর্ণ। একমাত্র এটিই প্রকৃত স্বর্ণ।

স্বর্ণ ডিজিটাল নয়

স্বর্ণ হচ্ছে বাস্তব অর্থ, ডিজিটাল মুদ্রা নয়। এভাবে স্বর্ণ সেসব রিস্ক থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারে ডিজিটাল কারেন্সি হরহামেশা যেগুলোর সম্মুখীন হয়।

অনেকাংশে টাকাও ডিজিটাল মুদ্রা। হয়তো আপনার পকেটে কিছু কাগুজে টাকা থাকতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগই ডিজিটাল কারেন্সি। ২০ টাকা মূল্য পরিশোধের জন্য আপনি পকেট থেকে ২০ টাকার নোট বের করতে পারেন, কিংবা আপনার ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বের করতে পারেন। এখন তো নগদ, বিকাশ, রকেট, উপায়-সহ আরও বহু উপায় আছে।

মাস শেষে আপনার বেতন দেওয়া হয় কীভাবে? আপনার বস আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। জাস্ট একটা সংখ্যা এসেছে। শপিং মলে, অনলাইন কেনাকাটায় আমরা বাস্তব টাকার চেয়ে ডিজিটাল টাকাতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। টাকার পরিবর্তে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বের করি। ফলে দেখা যায় ডিজিটাল টাকার তুলনায় আমাদের বাস্তব টাকার পরিমাণ নিতান্ত অল্প। যদিও এটি উন্নত বিশ্বের চিত্র, কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোও পিছিয়ে নেই। দিনদিন ডিজিটাল মুদ্রা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্টক মার্কেট—ইউনাইটেড স্টেটস ট্রেজারি মার্কেট—১৯৮০ সালের পর থেকে একটিও কাগজের সার্টিফিকেট ব্যবহার করেনি। হয়তো আপনার আশেপাশে খুঁজলে কারও চিলেকোঠায় সেগুলো পেতে পারেন। বাংলাদেশে দুটি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে—ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ। দুটিই এখন পুরোপুরি ডিজিটাল। তাদের সার্টিফিকেট এবং পেমেন্ট সবই ডিজিটাল।

ফলে দেখা যাচ্ছে 'ক্যাশলেস ডিজিটাল' সোসাইটি ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে। পর্যবেক্ষকরা এতদিন 'দ্য ওয়ার অব ক্যাশ' নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। এখন আপনার তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। কারণ সরকার এই যুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিজয়ী হয়ে গিয়েছে।

বাস্তবে যা হয়—আপনি যতই সৎ হোন না কেন, আপনি যদি বড় অঙ্কের অর্থ লেনদেন করেন, তবে মাদক ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসী কিংবা কর ফাঁকিবাজদের সন্দেহভাজনের তালিকায় আপনার নাম এসে যাবে। সাথে সরকারি নজরদারি বোনাস। যাদের হাতে স্বর্ণ নেই, তাদের ডিজিটাল সম্পদ আহরণ এবং এই সংশ্লিষ্ট

ঝামেলার ভেতর দিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আপনার ডিজিটাল ধনসম্পদ খুবই অনিরাপদ। বিদ্যুৎ বিভ্রাট, অবকাঠামোগত সমস্যা, বিনিময় হারের ওঠানামা, হ্যাকিং এবং অনলাইন চুরি-সহ সব ধরনের ঝুঁকির সহজ শিকার। এক চুটকিতে আপনার বিলিয়ন ডলারের সম্পদ হাওয়া করে দেবে, একে কি আদৌ সম্পদ বলা যায়?

সরকার যদি বলে এটিএম থেকে প্রতিদিন ৫০ টাকার বেশি তুলতে পারবেন না, ব্যাংক থেকেও না। আপনার দৈনন্দিন চলার জন্য ৫০ টাকাই যথেষ্ট। আপনি কী করবেন? থাকুক আপনার মিলিয়ন কিংবা বিলিয়ন ডলার ব্যাংকে। কী আসে যায়? মনে মনে হাসছেন আর ভাবছেন এও কি সম্ভব!

হ্যাঁ, ইউরোপীয় দেশ সাইপ্রাস আর গ্রিসে তাই ঘটেছিল ২০১৩ এবং ২০১৫ সালে। সরকার প্রতিদিন ৩০০ ডলার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। যখন অর্থনীতি ভেঙে পড়বে তখন আপনার দশাও এমনই হবে। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে ব্যাংকের ভল্টে সম্পদ 'তালা' মেরে রাখার চেয়ে বাস্তব সম্পদ সংগ্রহে মনোনিবেশ করা।

অর্থব্যবস্থার পতনের ইতিহাস এবং গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের সমাপ্তি

১৯৭১ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার স্বর্ণে কনভার্ট করা যেত। সে বছর আমেরিকার সরকার এই সুযোগ বন্ধ করে দেয়। তারপর থেকে সব দেশের সরকার এবং অর্থনীতিবিদরা ক্রমাগত স্বর্ণের বিরুদ্ধে কথা বলে যাওয়া সত্ত্বেও এখনো স্বর্ণই অর্থ।

বিগত শতকে তিনবার অর্থব্যবস্থায় ধস নেমেছিল। ১৯১৪ (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ), ১৯৩৯ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) এবং ১৯৭১ সালে। ১৯৯৮ এবং ২০০৮ সালে প্রায় ধসে গিয়েছিল। একদম কানের পাশ দিয়ে গিয়েছে। যেহেতু বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতি ডলারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এবং ডলার গ্লোবাল রিজার্ভ কারেন্সি ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে ডলার ধাক্কা খেলে গোটা বিশ্বের অর্থনীতি ধাক্কা খাবে। এর সূচনা হতে পারে ডলারের ওপর আস্থাহীনতা থেকে। ইতিহাস বলে প্রতি ৩০ বছর পরপর অর্থনীতি ধসে। সেই হিসেবে বলা চলে আমরা আরেকটি আগ্নেয়গিরির মুখে আছি। হয়তো আমাদের চেনাজানা বিশ্ব অর্থব্যবস্থার পতন অত্যাসন্ন, নতুন ব্যবস্থার সূর্যোদয় সন্নিকটে।

পূর্বেকার অর্থব্যবস্থাগুলো ধ্বংসের ফলে মানুষ গুহায় ফিরে যায়নি, ঘাস-লতাপাতা খেতে শুরু করেনি। অর্থব্যবস্থার ধস মানে হচ্ছে পুরাতন অর্থব্যবস্থার আলোকে

ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা আর সম্ভব হচ্ছে না, ফলে বড় অর্থনীতির, বড় বাণিজ্যের দেশগুলো টেবিলে বসে 'খেলার নতুন নিয়ম' ঘোষণা করবে।

যেমন ১৯১৪ সালের পতনের পর বড় শক্তিগুলো ১৯২২ সালে ইতালির জিনোয়াতে একত্র হয়ে নতুন নিয়ম ঘোষণা করেছিল, গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডকে একটা 'স্ট্যান্ডার্ডে' আনার চেষ্টা করেছিল। ১৯৩৯ সালের ধসের পর ১৯৪৪ সালে সেই বিখ্যাত কনফারেন্স হয়েছিল—ব্রেটন উডস, নিউহ্যাম্পশায়ারে। যেখানে নতুন করে ডলার-গোল্ড অর্থনীতি প্রবর্তন করা হয়। এবং এই কনফারেন্সের মাধ্যমেই আমেরিকা বিশ্বের মোড়ল হয়ে ওঠে। গোটা বিশ্বের অর্থনীতির চাবিকাঠি তার হাতে চলে যায়।

১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ডলারকে স্বর্ণে রূপান্তরের সুযোগ রহিত করে দেওয়ার পর আলোচনা আর কনফারেন্সের ম্যারাথন শুরু হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে দ্য স্মিথসোনিয়ান অ্যাগ্রিমেন্ট, যা ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে হয়েছিল। এবং কনফারেন্সের এই ধারা ১৯৮৫ সালে প্লাজা এ্যাকর্ড ও ১৯৮৭ সালে ল্যুভর এ্যাকর্ডের মাধ্যমে থিতু হয়। সেখানে খেলার নতুন নিয়ম পুনর্লিখিত হয়।

১৯৭১ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত বুজরুকি সব কাজকারবার চলছিল। আমেরিকা এই অল্প সময়ের ভেতরেই তিনবার অর্থনৈতিক মন্দার কবলে নিপতিত হয়। স্বর্ণের দাম আউন্স প্রতি ৩৫ ডলার থেকে মাত্র ৮০০ (আটশ) ডলারে গিয়ে পৌঁছে। মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ডলারের দাম অর্ধেকেরও বেশি পড়ে যায়। অবশেষে ১৯৮১ তে পল ভল্কার এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ডলারের ত্রাতা হিসেবে আভির্ভূত হন। পৃথিবী নতুন অর্থব্যবস্থায় যায়—দ্য কিং ডলার পিরিয়ড।

ভল্কারের অর্থনৈতিক পলিসি এবং রিগ্যানের আরোপিত ট্যাক্স ও নিয়ন্ত্রণের ফলে ডলারের লাগাম টেনে ধরা সম্ভব হয়। রিগ্যান বিশ্ববাসীকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, যদিও ডলারের বিপরীতে স্বর্ণ পাওয়া যাবে না, কিন্তু বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের জন্য ডলারই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। আমেরিকার বিজনেস পার্টনারদেকেও এই নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম হন। ফলে ১৯৮১ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ডলার বিশ্ব অর্থব্যবস্থাকে ভালোভাবেই সামলেছে। ২০০৭ পর্যন্ত টানা প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৮৭০ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের নানা রূপ প্রচলিত ছিল। তারপর ১৯৮০ থেকে ২০১০ পর্যন্ত কোনো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড নেই; বরং ডলার স্ট্যান্ডার্ড ছিল। ২০১০ থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাস্তবে কোনো স্ট্যান্ডার্ড নেই। আমরা উন্মুক্ত সাগরে ভাসমান। ২০০৭ থেকে আমরা

কনফিউজড, অস্থিতিশীল। আমাদের কোনো এঙ্কর পয়েন্ট বা নোঙ্গর ফেলার মতো ভরসাবিন্দু নেই।

অত্যাসন্ন সংকটের পর হয়তো আবার জিনোয়া বা ব্রেটন উডসের মতো বৈঠক শুরু হবে। খেলার 'নতুন' নিয়ম আসবে। এখন বিনিয়োগকারীদের সামনে জীবনমরণ প্রশ্ন হচ্ছে—কী হতে পারে সেই 'নতুন গেম'? এই প্রশ্নের উত্তরের ওপর ভিত্তি করেই এখন তাদের সম্পদ গড়া প্রয়োজন। যে জাদুর কাঠি অত্যাসন্ন বিপর্যয়ে তাদের সম্পদের সবচেয়ে ভালো সুরক্ষা দেবে, সেটাই সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

স্বর্ণ কখনো মূল্য হারাবে না

১৯৭১ সালের ১৫ই আগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন স্বর্ণের দরোজা বন্ধ করে দেন। সেই থেকে পরবর্তী দুই প্রজন্মের শিক্ষার্থীদেরকে নীতিনির্ধারক এবং 'প্রফেসররা' এই বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে, আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় স্বর্ণের কোনো জায়গা নেই।

বাস্তবতা হচ্ছে স্বর্ণ কখনোই মাঠ ছেড়ে যায়নি, অন্তরালে গিয়েছে মাত্র। ক্ষমতাসীন এলিটরা একদিকে জনসম্মুখে স্বর্ণকে উপেক্ষা করতে শুরু করেছে, স্বর্ণ নিয়ে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে, কিন্তু তলে তলে আবার ঠিকই স্বর্ণ কুক্ষিগত করে রেখেছে। স্বর্ণ যদি এতটাই মূল্যহীন হয়, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন এখনো ৮ হাজার টন স্বর্ণ ধরে রেখছে? কেন স্বর্ণের মজুত ২০ হাজার টন থেকে ৮ হাজার টনে নেমে আসার পর ডলারকে স্বর্ণে রূপান্তরের সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে? কেন জার্মানি এবং আইএমএফ ৩ হাজার টন করে স্বর্ণ মজুত করে রেখেছে? কেন চীন চুরি করে স্বর্ণ জমাচ্ছে? কেন রাশিয়া প্রতিবছর ১ হাজার টনেরও বেশি স্বর্ণ সংগ্রহ করছে? স্বর্ণ যদি বাস্তবেই এত মূল্যহীন হয়ে থাকে; তবে সবাই কেন স্বর্ণের জন্য খাবলাখাবলি করছে?

আসল বিষয় হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো যদি জনগণকে আশ্বস্ত করতে পারে যে, স্বর্ণের সাথে অর্থের কোনোরূপ সম্পর্ক নেই, তবে তারা যত খুশি টাকা ছাপতে পারবে। এজন্যই বেন বেরনাঙ্ক থেকে শুরু করে এ্যালান গ্রিন্সপ্যান-সহ সবাই স্বর্ণকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে যাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে—অর্থ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার সাথে জনগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বস্তুত, স্বর্ণই এখনো পর্যন্ত বিশ্ব-অর্থব্যবস্থার মূল ভিত্তি, পাদপ্রদীপ।

স্বর্ণই অর্থ, অন্যকিছু নয়

ইতালিকে বলা হয় ইউরোপের বুট জুতা। কারণ একটা বুট জুতার আদলে গোটা ইতালি সেঁধিয়ে আছে ভূমধ্যসাগরে। ফলে ইউরোপের নৌবাণিজ্যে ইতালি সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষত চতুর্দশ শতকে। সে সময় উত্তর ইতালির ফ্লোরেন্স শহরটি ফুলে ফেঁপে ওঠে। গোটা ইউরোপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় শহরটি। বাণিজ্যের হাত ধরে শুরু হওয়া উত্থান শিল্প, সাহিত্য, নির্মাণ-সহ সব ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীদের মাঝে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয় কে কার চেয়ে জমকালো ভবন বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারে। রুজির আশায় সব শ্রেণি, সব পেশা থেকে ভাগ্যান্বেষী মানুষ ফ্লোরেন্সমুখী হতে শুরু করে।

ফ্লোরেন্সকে বলা হয় রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণের অগ্রদূত। ইউরোপীয় রেনেসাঁ। বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে ফ্লোরেন্সে প্রচুর অর্থ জমা হতে শুরু করে। লেনদেনের মচ্ছব লেগেই থাকত। অর্থ বলতে সে সময় বোঝানো হতো স্বর্ণ। প্রাচীন যুগ থেকে 'সম্পদের' যে রূপগুলো জনপ্রিয় তন্মধ্যে ভূমিও ছিল। কিন্তু ভূমি অর্থ হয়ে উঠতে পারেনি। স্থবিরতা, লেনদেন অযোগ্যতা এবং মূল্য নির্ধারণে অক্ষমতার কারণে। ফ্লোরেন্সের যখন পূর্ণ যৌবন, প্রতিটি ঘরই ছিল একেকটা বাণিজ্যকেন্দ্র।

নগর-রাষ্ট্র ফ্লোরেন্সের ব্যবসায়ীদের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হতো তাদের বারান্দা। সেখানে একধরনের টুল পেতে বসে থাকত ম্যানেজার, ক্যাশিয়াররা। টুলগুলোকে বানকো (Banco) নামে ডাকা হতো। সব ধরনের বাণিজ্যিক লেনদেনের কেন্দ্রবিন্দু- বানকো। যা থেকে এসেছে আমাদের আজকের 'ব্যাংক'।

তো প্রাচীন বানকোতে বসা মহাজনরা স্বর্ণ নিত, পাশাপাশি স্বর্ণের রিসিটও গ্রহণ করত। নিজেরাও এসব রিসিট জারি করত। বড় বড় ব্যবসায়ী মহাজনরা বড় বড় বানকো খুলত। সেসবের শাখা ছড়িয়ে দিত লন্ডন, প্যারিস-সহ ইউরোপের বড় বড় শহর, নগর, বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রে। ফলে ব্যবসায় গতি আসে। ব্যবসায়ীরা দূরদূরান্তের বাণিজ্যপথে নগদ স্বর্ণদানার পরিবর্তে বড় কোনো 'বানকো'তে স্বর্ণ জমা দিয়ে রিসিট নিয়ে নিত। যে শহরে যাচ্ছে, বানকোর সেখানকার শাখা থেকে স্বর্ণ তুলে নিতে পারত, কিংবা চাইলে জাস্ট কাগজ দিয়েই লেনদেন সেরে ফেলতে পারত।

মহাজনরা দেখল স্বর্ণ এভাবে ফেলে রেখে লাভ নেই। এগুলো বরং কিং, প্রিন্স, জমিদারদের ঋণ দেওয়া যায়। বছর বছর সুদ আদায় করা যাবে কিংবা অন্যান্য সুবিধা আদায় করা যাবে। তারা স্বর্ণগুলো ঋণ দিতে শুরু করে। পাশাপাশি স্বর্ণের বিপরীতে জারি করা কাগজের পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়। কারণ তাদের অভিজ্ঞতা

বলে সবাই একসাথে স্বর্ণ তুলতে আসবে না। স্বর্ণগুলো প্রিন্সদের ঋণ দিতেও সমস্যা ছিল না। কারণ মানুষ স্বর্ণ তুলতে এলে প্রিন্সদের নিকট থেকে এনে দিয়ে দেওয়া যেত। ফলে দেখা যাচ্ছে 'বানকো'গুলো যে পরিমাণ কাগজের দায় নিজেদের কাঁধে নিচ্ছে, ভিন্ন ভাষায় বললে যে পরিমাণ লায়াবিলিটি নিচ্ছে, তার সমপরিমাণ সম্পদ তার হাতে থাকত না। এভাবেই সূচনা হয় পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম 'ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং' ব্যবস্থার।

ব্যাংকিং, ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ এবং কাগুজে মুদ্রার প্রচলন সত্ত্বেও স্বর্ণই ছিল প্রধান 'অর্থ'। রাজা-প্রজা সবাই স্বর্ণই সংরক্ষণ করত, কাগজ নয়।

ফ্লোরেন্সে যখন স্বর্ণের বাজার রমরমা, তখন এশিয়ায় আরেকটি বাণিজ্যকেন্দ্রের উত্থান ঘটে—চীন। ইতালির মতো চীনও প্রাচীন নৌবাণিজ্যের অন্যতম প্রধান রুট। চীনারা স্বর্ণের পাশাপাশি রৌপ্যমুদ্রাও গ্রহণ করত। সব দেশের ব্যবসায়ীরা রৌপ্যমুদ্রায় চীনের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন করতে পারত। মূলত চীনের হাত ধরেই রৌপ্যমুদ্রা বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করে। তাই বলা হয় তৎকালীন পৃথিবীর ইন্টারন্যাশনাল 'মানি' ছিল গোল্ড, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল 'কারেন্সি' ছিল রুপা। চীনের পর আরও অনেক সাম্রাজ্য রৌপ্যমুদ্রা গ্রহণ ও প্রচলন করতে শুরু করে।

১৯৩৩ সালে আমেরিকায় স্বর্ণ নিষিদ্ধ হওয়ার পরও রুপা বহাল তবিয়তে ছিল। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সেখানে ৯০% খাঁটি রৌপ্যমুদ্রা দেদারসে চলত। ১৯৬৫ সাল থেকে ভেজাল মিশ্রণ শুরু হয়। কয়েনের মান অনুযায়ী ৯০ থেকে ৪০% পর্যন্ত রুপা থাকত, সাথে মিশ্রিত হতো কপার, নিকেল বা অন্য ধাতব পদার্থ। সত্তরের দশকের শুরুর দিকে রৌপ্যমুদ্রায় রুপার পরিমাণ নেমে আসে জিরোতে। তারপর থেকে শুরু হয় ধাতব মুদ্রা। দেখা যাচ্ছে আদিম সমাজ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত পৃথিবীবাসীর অর্থ ছিল স্বর্ণ-রুপা। নাগরিকরা কোনো-না-কোনোভাবে এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিল, এগুলো দিয়েই লেনদেন করত।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সারাজেভো, বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনার রাজধানী। উসমানিরা ৪০০ বছর ধরে শহরটি শাসন করেছে। শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। ইউরোপ ও ইউরোপের বাইরে থেকে বড় বড় ব্যবসায়ীরা এখানে আসত। ১৮৭৮ সালে নানা ঘটন-অঘটন ও যুদ্ধবিগ্রহের পর চুক্তির মাধ্যমে সারাজেভো শহরটি-সহ গোটা বসনিয়া হার্জেগোভিনা অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই অঞ্চলে তখন তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ছিল। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য, উসমানি সালতানাত এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী দেশ সার্বিয়া। সার্বিয়াকে কেন্দ্র করে বলকান দ্বন্দ্বে রুশ সাম্রাজ্যও জড়িয়ে পড়ে। কারণ সার্বিয়ার মিত্রশক্তি ছিল রুশ সাম্রাজ্য।

চুক্তিতে ছিল ৩০ বছরের জন্য শহরটি অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয়দের হাতে যাবে। অস্ট্রীয়রা এসে শহরে প্রভূত বিনিয়োগ করে। সারাজেভোর কেন্দ্রস্থলে মিটিং পয়েন্ট অব কালচারস নামে একটি পয়েন্ট আছে। রাস্তায় লেখা। এই লেখার দুইপাশে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের দেখা মেলে। একপাশে তুর্কি স্থাপত্য, অপরপাশে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয়।

অস্ট্রীয়দের হাতে যাওয়ার পর থেকেই সারাজেভোতে ধিকিধিকি বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকে। ইয়ং বসনিয়ানস নামে একটি বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে। মূলত তরুণদের দল। এদের প্রশিক্ষণ দিত পার্শ্ববর্তী প্রতিপক্ষ দেশ সার্বিয়ার আরেকটি সশস্ত্র গোষ্ঠী, নাম ব্ল্যাক হ্যান্ড। ব্ল্যাক হ্যান্ড সার্বীয় সেনাবাহিনীর স্লিপার সেল ছিল। তাদের প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে অস্ত্র সরবরাহ সবকিছুই করত সার্বীয় সেনাবাহিনী।

১৯১৪ সালের জুনে সারাজেভো প্রদর্শনে আসে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী, প্রিন্স আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড। ফার্ডিনান্ড বিয়ে করেছেন সোফিয়া নামে এক সুন্দরীকে। চেক বংশোদ্ভূত এই নারী ইউরোপের কোনো রাজরক্তের অধিকারী ছিলেন না। ফলে বিয়ে নিয়ে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সম্রাট চাচা ফ্রাঞ্জ জোসেফের সাথে ভাতিজা প্রিন্স ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। বহু দেনদরবারের পর সিংহাসন থেকে নিজের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারদের দাবি তুলে নেওয়ার পর ফার্ডিনান্ড সোফিয়াকে বিয়ে করার অনুমতি পান।

কিন্তু রাজমহলে সোফিয়া কখনোই যথাযথ সম্মান পাননি। রাজকীয় ভোজসভায় তাকে সবার পর প্রবেশ করতে হতো। সাথে কোনো সেবিকা থাকত না। বসতে হতো স্বামী থেকে অনেক দূরে।

যা-ই হোক, জুনে সস্ত্রীক ফার্ডিনান্ড সারাজেভো ভ্রমণের প্রোগ্রাম হয়। সবাই জানত এই ভ্রমণে বহু আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু ফার্ডিনান্ড যেতে রাজি ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর ইন্সপেক্টর জেনারেল। তাই সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ পরিদর্শনে যেতে সম্মত হন।

২৮ জুন, ফার্ডিনান্ডের রাজকীয় ভ্রমণ শেষ হতে মাত্র একদিন বাকি। রাজদম্পতি ট্রেনে চড়ে শহর পরিদর্শনে বের হন। ট্রেনজার্নি শেষে তাদের নিয়ে যাওয়া হবে সিটি হলে। একটি হুডখোলা গাড়িতে। প্রিন্সের গাড়ির সামনে নিরাপত্তারক্ষীদের গাড়িতে ছয়জন স্পেশাল ফোর্স সদস্য থাকার কথা ছিল। কিন্তু তখন ছিল মাত্র একজন। আর তিনজন পুলিশ। আয়োজকরা ব্যস্ত ছিলেন প্রিন্সের সান্ধ্যভোজের মেনু নির্ধারণে।

প্রিন্সের শহর পরিদর্শনের রুট আগে থেকেই ঘোষিত ছিল। সেখানে অপেক্ষা করছিল সম্ভাব্য ঘাতকরা। অ্যাপেল কী (Appel Quay), সারাজেভোর প্রধান অনুষ্ঠানস্থলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ক্যাব্রিনোভিক। প্রিন্সকে বহনকারী গাড়ি কোনটি তা জিজ্ঞেস করে সেটি লক্ষ করে হাতে থাকা হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়ে মারে। ড্রপ খেয়ে গ্রেনেডটি চলে যায় পেছনের গাড়িতে। বিস্ফোরিত হওয়ার পর কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী আর দর্শনার্থী হতাহত হন। প্রিন্স এবং তার স্ত্রী সোফিয়া নিরাপদেই ছিল। ক্যাব্রিনোভিককে ধরে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে সে চিৎকার করে বলছিল, আই এম দ্য সাবীয় হিরো। শহরের ৪০ ভাগ জনসংখ্যা ছিল সাবীয়, ৩০ ভাগ তুর্কি, ২০ শতাংশ ক্রোয়েট-সহ অন্যান্য বহু জাতিগোষ্ঠী।

অনুষ্ঠান শেষে প্রিন্সপত্নি গোঁ ধরেন যে, তিনি আহতদের দেখতে হাসপাতালে যাবেন। পরিস্থিতি ছিল খুবই ধোঁয়াশাপূর্ণ। পুনরায় আক্রমণের তীব্র আশঙ্কা ছিল। স্ত্রীর আবদার রক্ষা করতে হাসপাতাল যেতে সম্মত হন। রাজবহরের গাড়িগুলো তীব্র গতিতে অ্যাপেল কী অতিক্রমের সময় প্রথম তিনটি গাড়ি রং সাইডে চলে যায়। রাইট সাইডে আনার সময় বহরের গতি শ্লথ হয়ে যায়। ইয়ং বসনিয়ানসের ইয়ং সদস্য প্রিন্সিপ একদম কাছ থেকে প্রিন্সকে গুলি করে। তার স্ত্রীকেও। দুজনই মারা যায়।

ঘটনার সাথে সার্বিয়ার যোগসাজশের অভিযোগে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সার্বিয়াকে কিছু শর্তারোপ করে এবং আল্টিমেটাম বেঁধে দেয়। বাহ্যত শর্তগুলো মেনে নেওয়ার মতো নয়। একমাস পর, ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই অস্ট্রো-হাঙ্গেরি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সার্বিয়াকে সহায়তায় এগিয়ে আসে রুশ সাম্রাজ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়।[১]

যুদ্ধ শুরুর পরপরই সব দেশ, সব সাম্রাজ্য তাদের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড স্থগিত করে। টাকার বিনিময়ে স্বর্ণ উত্তোলনের সুযোগ বাতিল করে দেয়। তবে ঘোষণা অনুযায়ী তা ছিল সাময়িক। পরিস্থিতি 'স্বাভাবিক' হয়ে গেলেই সবকিছু পূর্বের মতো চলবে। তারা জানত যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ধারণ করবে 'অর্থ' গোল্ড। শুধু গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড স্থগিত করাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নাগরিকদের হাতে থাকা স্বর্ণ সংগ্রহের জন্য অনেক দেশ ওয়ার বন্ড ছাড়ে। সেসব বন্ডের বিনিময়ে স্বর্ণ নিয়ে নিচ্ছিল নাগরিকরাও দেশপ্রেমের অংশ নির্দ্বিধায় কর্তৃপক্ষের হাতে স্বর্ণ তুলে দিচ্ছিল।

তবে দুটি দেশ ছিল ব্যতিক্রম—যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য। ১৯১৪ সালে লন্ডন বিশ্ববাণিজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্র ছিল। ফ্রেঞ্চ সরকারের হাতে থাকা স্টার্লিং এবং

---

[১] ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ডের হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত তথ্যের জন্য এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা দ্রষ্টব্য : https://fliplink.io/J0ua9 এবং https://fliplink.io/fl6KJ

ন্যান্য সিকিউরিটিজ ভাঙিয়ে স্বর্ণ নিয়ে নিচ্ছিল। এবং সেগুলো শুধু কাগুজে লেনদেনে সীমাবদ্ধ না থেকে লন্ডন থেকে প্যারিসে বাস্তব স্বর্ণের শিপমেন্ট হচ্ছিল। যুক্তরাজ্যে স্বর্ণ সংকট দেখা দিলে তারা আবার তাদের সিকিউরিটিজের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বর্ণ নিয়ে নিচ্ছিল।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাধ সাধে জার্মান ইউ-বোট। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রতিপক্ষের সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন ছিল জার্মান সাবমেরিন ইউ-বোটগুলো। গোটা আটলান্টিকে এগুলো যমদূত হিসেবে আবির্ভূত হয়। অন্যান্য জাহাজের পাশাপাশি নিউইয়র্ক থেকে লন্ডনগামী স্বর্ণভরতি জাহাজও ইউ বোটের নিশানায় পরিণত হয়। অনুরূপ যুক্তরাষ্ট্র লন্ডনকে স্বর্ণ দিয়ে খালি হাতে বসেছিল না। তারা আবার লন্ডনের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্রের বিনিময়ে স্বর্ণ নিয়ে নিচ্ছিল! কিন্তু এসব খাদ্য আর অস্ত্রবাহী জাহাজগুলোও ইউবোটের চোখ এড়াতে পারত না।

সমস্যার সমাধানে ব্যাংক অব ইংল্যান্ড কানাডার অটোয়ায় শাখা খুলে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বর্ণের চালান যেত কানাডায়। ফলে সেগুলো ইউবোটের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে হয়নি। মার্কিন ট্রেজারির উদ্যোগে ১৯১৪ সালের নভেম্বর নাগাদ স্বর্ণ সংগ্রহের এই হিড়িক স্তিমিত হয়ে আসে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালটুকুতে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র নানাভাবে নাগরিকদের এবং প্রাইভেট ব্যাংকগুলোর হাত থেকে স্বর্ণ নিয়ে নেয়। ছোট ছোট কয়েন গলিয়ে ৪০০ আউন্স স্বর্ণের বার বানিয়ে ফেলে।

ফলে দেখা গেল যুদ্ধ শেষে যদিও সরকারগুলো পুনরায় গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে যায় এবং কারেন্সির বিনিময়ে স্বর্ণ সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু ৪০০ আউন্সের বার কেনার মতো যথেষ্ট অর্থ সাধারণ নাগরিকদের হাতে ছিল না। বড় বড় কর্পোরেটগুলোই শুধু এই সুবিধা ভোগ করতে পারত। পাশাপাশি চার বছর পেপার কারেন্সি লেনদেনের ফলে নাগরিকরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। স্বর্ণের কথা বেমালুম ভুলে কাগুজে টাকায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে শুরু করেছে। চার বছরে 'পাবলিক মানি' 'প্রাইভেট মানিতে' রূপান্তরিত হয়ে গেছে! স্বর্ণ জনগণের পকেট থেকে ব্যাংকের ভল্টে থিতু হয়েছে। দৃষ্টিসীমার বাইরে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রেটন উডসের মাধ্যমে পুনরায় গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ফিরে আসে। কিন্তু সমস্যা বাধে ভিন্ন জায়গায়। বিধ্বস্ত ইউরোপীয় শক্তিগুলোর প্রধান রপ্তানিকেন্দ্র ছিল আমেরিকা। আমেরিকা তখন বিশ্বের অধিকাংশ সম্পদের আধার। জনগণের হাতে কচকচে টাকা। সে টাকায় ইউরোপীয় চকলেট থেকে শুরু করে ওয়াইন—সবই বিকোতে শুরু করে। রপ্তানিকারক দেশগুলো রপ্তানিবাবদ প্রাপ্ত ডলার ভাঙিয়ে স্বর্ণ সংগ্রহ করত। কিন্তু সেসব স্বর্ণ আদতে আমেরিকার বাইরে যেত না। আমেরিকাতেই থাকত, কাগজে-কলমে স্বর্ণের মালিক।

কিন্তু একটি দেশ ছিল ব্যতিক্রম—ফ্রান্স। তারা নিউইয়র্ক থেকে জাহাজভরতি স্বর্ণ প্যারিসে নিয়ে যেত। কিছুদিন পর ফ্রান্সের সাথে যুক্ত হয় সুইজারল্যান্ড এবং স্পেন। ফলে স্বর্ণের ক্রমবর্ধমান বহির্গমনের ফলে আমেরিকা ব্রেটন উডস ব্যবস্থা ভাঙতে বাধ্য হয়। ১৯৭১ সালে ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণ সংগ্রহের সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কিন্তু এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, এ ক্ষেত্রেও আমেরিকার কনভার্টিবিলিটি সাসপেনশন ছিল সাময়িক। ধীরে ধীরে ধাক্কা সয়ে এলে তা স্থায়ী করা হয়। দ্বিতীয়ত, ডলারের পরও পৃথিবীতে একটা কারেন্সি ছিল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডভিত্তিক। তবে সেটা কোনো দেশের কারেন্সি না, আইএমএফের জারিকৃত ইন্টারন্যাশনাল কারেন্সি—এসআরডি।

ডলারের ওপর ক্রমবর্ধমান আস্থাহীনতার কারণে আইএমএফ ১৯৬৯ সালে আন্তর্জাতিক কারেন্সি হিসেবে এসআরডি চালু করে। তাই শুরু থেকে এই কারেন্সির নাম পড়ে যায় 'পেপার গোল্ড'। কিন্তু ১৯৭৩ সালে এসে এসআরডিও স্বর্ণের সাথে সংযোগ হারায়। আইএমএফ এসআরডির বিপরীতে থাকা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বাতিল করে দেয়। ফলে বিশ্বব্যাপী এখন এক কাগজের বিপরীতে ভিন্ন কাগজ। নাথিং এলস।

এই সময়ে বিশ্বকে স্বর্ণহীন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভূমিকা পালন করেন এক ভদ্রলোক। তার আম মিল্টন ফ্রাইডম্যান। ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর প্রফেসর। ব্রেটন উডস সিস্টেমের ত্রুটি বর্ণনায় তার বক্তব্যের সারাংশ হচ্ছে—গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড এবং ফিক্সড এক্সচেঞ্জ রেট বিশিষ্ট কারেন্সির কারণে সংকটকালে দেশগুলোর অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিপরীতে তিনি 'ইলাস্টিক মানি'র ধারণা প্রবর্তন করেন। এককথায় ইলাস্টিক মানি এমন যা যত খুশি ছাপা যাবে, কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

তার এই 'অসাধারণ' গবেষণাকর্মের ফলে ১৯৭৬ সালে নোবেল পুরস্কার জিতে নেন। তার গবেষণা কতটুকু সত্য-কতটুকু মিথ্যা সেসব আলোচনার বাইরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পয়েন্টটা, সেটি হচ্ছে অ্যাকাডেমিক কর্তৃক গ্লোবাল পলিটিক্যাল রেজিমের স্বার্থরক্ষা, বিনিময়ে অ্যাকাডেমিকদের কিছু 'গাজরপ্রাপ্তি'।

বিশ্ব অর্থব্যবস্থার মোড়লদের মনে হয়েছে এখন স্বর্ণ বাদ দেওয়া দরকার, বাতিল হয়েছে। এবং সাথে সাথেই এর পক্ষে 'নিরপেক্ষ অ্যাকাডেমিক' গবেষণা হাজির! এবং গবেষক সাহেবের প্রভূত সম্মানপ্রাপ্তি। অনেকে গ্লোবাল রেজিমদের এসব কারসাজিকে ভুয়া মনে করেন। বস্তুত আন্তর্জাতিক পলিটিক্যাল রেজিম এবং ফেইক নিরপেক্ষ অ্যাকাডেমিয়া কীভাবে হাত ধরাধরি করে চলে, সেসব না জানার

কারণেই এমন হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতাবানরা শুধু তাদেরই পরিচিত করবে, তাদের মতবাদই প্রচার করবে, তাদেরই সম্মানিত করবে যাদের 'মগজ' তাদের চরণতলে নিবেদিত। বিনিময়ে তারা এই মগজগুলোকে পুরস্কৃত করে। মগজের দাসত্বের পরিমাণভেদে প্রাপ্ত 'হালুয়ায়' তারতম্য হয়। হালুয়ার রূপ স্থানীয় ইউনিভার্সিটির লেকচারার পদ থেকে শুরু করে নোবেলপ্রাপ্তি পর্যন্ত হতে পারে।[১]

স্বর্ণ ও আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা

টেলিভিশনে যেসব মুখরোচক আলাপসালাপ চলে, সেগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে যদি আপনি বিশ্ব-অর্থব্যবস্থার দিকে তাকান, দেখতে পাবেন স্বর্ণের পুনরাগমন ঘটছে। বরং পৃথিবী ইতিমধ্যেই একটি ছায়া-গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের ভেতর আছে এবং প্রতিনিয়ত একটি আনুষ্ঠানিক গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের দিকে ধাবিত হচ্ছে—স্বর্ণই হবে অর্থ। এটি সুদূর ভবিষ্যতের কোনো খোয়াব নয়; বরং অদূর বাস্তবতা। স্বর্ণ অর্থব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্রে চলে এসেছে—এর বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে।

ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড (আইএমএফ) হচ্ছে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম স্বর্ণের মজুতদার। প্রথম স্থানে আছে যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় স্থানে জার্মানি, তৃতীয় স্থানে আইএমএফ। তবে ধারণা করা হয় চীন দ্বিতীয় স্থানে আছে, কিন্তু তারা তাদের স্বর্ণের মজুত কখনোই প্রকাশ করে না। এবং আদতে কী পরিমাণ স্বর্ণ তাদের হাতে আছে তা যাচাই করা দুরূহ।

যা-ই হোক, আইএমএফ তার অভিজ্ঞ টেকনোক্র্যাট এবং দক্ষ আমলাদের মাধ্যমে বিশ্ব-অর্থব্যবস্থায় প্রভূত প্রভাব রাখে। ছোট ছোট দেশের অর্থনৈতিক পলিসি নির্ধারণ করে দেওয়া, কখনো চাপিয়ে দেওয়া, দেশীয় অর্থনীতিবিদদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্ধারণ করে দেওয়া, আপদকালে লোন প্রদান-সহ অনেক অর্থনৈতিক কাজ করে থাকে। ফলে দেশগুলোর অর্থনৈতিক পলিসিতে আইএমএফের প্রভাব অপরিসীম।

বাহ্যত দেখায় যে তারা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর রক্ষক, বন্ধু। বাস্তবতা হচ্ছে তারা হিংস্র মুনাফাখোর করপোরেশন। মাঝে মাঝে একটু-আধটু দান-দক্ষিণা করে সেগুলোই ঢোল পিটিয়ে বেড়ায়। ১৯৪৪ সালের ব্রেটন উডস কনফারেন্সের পর এর জন্ম। তবে কার্যক্রম শুরু হয় চল্লিশ দশকের শেষ নাগাদ। তখন এটি বড় বড় দেশগুলোকে ঋণ সহায়তা দিত।

---

[১] James Rickards, *The Road to Ruin; The Global Elites'Secret Plan for the Next Financial Crisis* বই থেকে এই পরিচ্ছেদের অবশিষ্ট তথ্যাদি গৃহীত হয়েছে।

ধরুন, কোনো দেশ বছরের পর বছর ব্যালান্স অব পেমেন্ট ডেফিশিটে (আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্যহীনতা বা রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি) ভুগছে। যেহেতু অন্য দেশ থেকে আমদানি করতে ডলার প্রয়োজন, তাই কোনো দেশের যদি আমদানি বেশি হয়ে যায়, রপ্তানি কম হয়, তখন সে ডলার সংকটে ভোগে। আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করার মতো সক্ষমতাও অনেক ক্ষেত্রে থাকে না। তখন রপ্তানি বৃদ্ধির একটি উপায় হচ্ছে সে দেশের টাকার মূল্য কমিয়ে দেওয়া বা মুদ্রাস্ফীতি ঘটানো। মুদ্রাস্ফীতি কীভাবে রপ্তানি বাড়ায় তা পূর্বে আমরা দেখিয়েছি।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ব্রেটন উডস সিস্টেমে কারেন্সির দাম হ্রাসবৃদ্ধি করার কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ এটি ছিল ফিক্সড এক্সচেঞ্জ রেটভিত্তিক অর্থব্যবস্থা। ফলে দেশগুলো বাধ্য হয়ে আইএমএফের শরণাপন্ন হতে হতো। আইএমএফ কিছু ঋণ দিত, সাথে দিত এক গাদা শর্ত। তাদের অফিশিয়াল ভাষ্যমতে—তারা এমন সব শর্ত আরোপ করবে, যেগুলো সে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এবং সে অনুপাতে দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের পর যখন রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, তখন আইএমএফ তাদের ঋণ আদায় করে নেবে। বিশেষ ক্ষেত্রে আইএমএফ মুদ্রাস্ফীতির অনুমতি দিত। কিন্তু এটা শুধু তখন, যখন বাকি সব পন্থা অবলম্বন করা শেষ। ততদিনে একটি দেশ ফতুর হয়ে যেত।

আইএমএফের ফিক্সড এক্সচেঞ্জ রেট ষাটের দশকের শেষদিকে এবং সত্তরের দশকের শুরুর দিকে ভেঙে পড়তে শুরু করে। কারণ ব্রিটেন একচেটিয়াভাবে ডলারের বিপরীতে স্টার্লিং-এর দাম পুনর্নির্ধারণ করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রও ডলারের বিপরীতে স্বর্ণ এক্সচেঞ্জের সুযোগ বাতিল করে দেয়। ফিক্সড এক্সচেঞ্জ রেটের মৃত্যু ঘটে। তখন থেকে আমরা যে সিস্টেমে আছি তাকে বলা হয়—ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট বা ভাসমান বিনিময় হার। অনিশ্চিত, অস্থিতিশীল।

আশির দশকের পর পরবর্তী ২০ বছর আইএমএফ ছিল উন্মাদপ্রায়। ব্রেটন উডস সিস্টেমের অধীনে তাদের যে মূল কাজ ছিল—ফিক্সড এক্সচেঞ্জ রেট ধরে রাখা, ততদিনে তা উধাও। ফলে তারা নতুন নতুন কাস্টমার খুঁজতে শুরু করে। ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকে উদীয়মান দেশগুলোকে ঋণপ্রদান কার্যক্রম শুরু করে।

আইএমএফের যা-ই কিছুটা সুনাম ছিল, ১৯৯৭-৯৮ সালের দিকে এশিয়ার অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে তা ধুলোয় মিশে যায়। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায়, দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে প্রায়ই দাঙ্গা বাধত। বহু মানুষের জীবন গিয়েছে, রক্ত ঝরেছে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অনেক নোবেল বিজয়ীর ভাষ্যমতে এই অর্থনৈতিক সংকটের কারণ ছিল আইএমএফের কুপরামর্শ।

আশির দশকে স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম নামে আইএমএফ কর্তৃক ছোট দেশগুলোর অর্থনীতি পুনর্গঠন প্রক্রিয়া জোরেশোরে চলমান ছিল। এই প্রোগ্রাম মূলত ছিল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রতিরোধ করে পশ্চিমাদের মার্কেট বেজড লিবারেল ইকোনোমি চাপিয়ে দেওয়ার একটা হাতিয়ার। লিবারেল ইকোনোমিতে সব সেক্টরের যথাসম্ভব প্রাইভেটাইজেশন করতে হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি সেবা, সব ব্যক্তি-মালিকানায় ছেড়ে দিতে হয়। ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানের লাখ লাখ মানুষ জীবিকা হারায়। পূর্বে হাসপাতাল, শিক্ষা, যাতায়াত, বিদ্যুৎ, গ্যাস-সহ যেসব সরকারি সেবা মানুষ স্বল্পমূল্যে পেত, সেগুলো তখন ব্যক্তি-মালিকাধীন কোম্পানির নিকট থেকে উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে হয়। এভাবে এই প্রোগ্রামের কুফলে দেশে দেশে কোটি কোটি বনি আদম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। দেশ উন্নত হওয়ার পরিবর্তে আরও গভীর খাদে নিপতিত হয়েছে। ফুলে ফেঁপে কলাগাছ হয়েছে পুঁজিবাদী পয়সাওয়ালারা।

২০০০ সাল নাগাদ আইএমএফের অবস্থা গিয়ে দাঁড়ায় সেই তিমির মতো, যে তীরে এসে আটকা পড়েছে, না পারছে উঠতে, না পারছে সাগরে ফিরে যেতে। কেউ জানত না কী করতে হবে, যা করা হচ্ছে তা কীভাবে করা উচিত। ফলে ২০০৬ সাল নাগাদ জনপরিসরে আইএমএফ বিলুপ্ত করে দেওয়ার দাবি উঠতে শুরু করে। তারপর? তারপর হঠাৎ আইএমএফের দিন ফিরল। কথায় বলে কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দার ফলে যদিও গোটা বিশ্বের সর্বনাশ হয়েছে, কিন্তু আইএমএফের সামনে নতুন করে খেলায় ফিরে আসার সুযোগ তৈরি হয়েছে। উদীয়মান অর্থনৈতিক মোড়লদের ফোরাম জি টুয়েন্টির অঘোষিত সচিবালয় হয়ে উঠে আইএমএফ। জি টুয়েন্টি মূলত সরকারপ্রধানদের ক্লাব। তাদের অর্থনীতির অ্যাকাডেমিক জ্ঞান নেই। অপরদিকে আইএমএফ এক ঝাঁক বেকার বিশেষজ্ঞ নিয়ে বসে আছে। ফলে জি টুয়েন্টির স্টাফ, গবেষক এবং টেকনিক্যাল সাপোর্টদাতা হয়ে ওঠে আইএমএফ। সেই থেকে তারা হাত ধরাধরি করে চলছে।

আইএমএফের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটা বেশ অদ্ভুত। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমপক্ষে ৮৫% ভোট দরকার। ওদিকে এক আমেরিকার ভোটাধিকারই ১৬%। যার অর্থ হচ্ছে বাকি সব দেশ মিলেও যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, আমেরিকা চাইলে একা সেই সিদ্ধান্ত বানচাল করে দিতে পারে। কারণ সে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট না দিলে ভোটের পরিমাণ হবে ৮৪%!

মজার ব্যাপার হচ্ছে এলিট জি ২০-এর সাথে সম্মিলনের পর থেকে আইএমএফের ঋণপ্রদান প্রক্রিয়ার অধিকতর রাজনৈতিকীকরণ হয়েছে। এটি পুনরায় তার মূল ফোকাস পয়েন্টে ফিরে গেছে—ধনী দেশগুলোকে ঋণপ্রদান।

ফলে আইএমএফের ঋণের প্রায় পুরোটাই যাচ্ছে ইউরোপে। ঋণ পাচ্ছে পোল্যান্ড, গ্রিস, পর্তুগাল, আয়ারল্যান্ড। বতসোয়ানা বা জ্যামাইকা পাচ্ছে না।

আইএমএফ নোট ইস্যু করে থাকে। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে গোটা বিশ্বের নোট ডলারের সাথে সম্পৃক্ত হলেও, আইএমএফের নোট ডলারভিত্তিক না। এটি স্পেশাল ড্রইং রাইটস বা এসডিআরভিত্তিক।

এখন কথা হচ্ছে এসডিআর কী? আপনি চাইলেই এটিএম বুথে গিয়ে এসডিআর তুলে আনতে পারবেন না। পকেটে এসডিআর নিয়ে ঘুরতে পারবেন না। কিন্তু এসডিআর অর্থ। গ্লোবাল কারেন্সি এবং দিনদিন ডলারের গুরুত্ব যত কমছে, এসডিআরের গুরুত্ব বাড়ছে।

কাজটা কীভাবে হয়? আইএমএফের ভেতর ট্রেডিং ডেস্ক আছে, এখানে এসডিআরকে অন্যান্য কারেন্সিতে বদল করা হয়। বৈশ্বিক সংকটের সময় আইএমএফ এসডিআর ঘোষণা করে। যেমন করোনাকালে ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি এসডিআর ঘোষিত হয়েছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাদের শেয়ার অনুপাতে এসডিআর পায়। যেমন যদি হাঙ্গেরির শেয়ার হয় ৫%, এবং করোনা উপলক্ষ্যে ১ লাখ এসডিআর ঘোষণা করা হয়, তবে হাঙ্গেরির ৫% তথা ৫ হাজার পাবে। কখনো এমন হয় যে, কোনো একটা সদস্য রাষ্ট্রের এসডিআর প্রয়োজন নেই, তার প্রয়োজন ভিন্ন কোনো দেশের মুদ্রা। তখন সে এসডিআর সেই মুদ্রায় পরিবর্তন করে নিতে পারবে।

উদাহরণ আমরা হাঙ্গেরির কথা উল্লেখ করতে পারি। ২০০০ সালে হাঙ্গেরির ব্যাংকগুলো জনগণকে দুটি মুদ্রায় মর্টগেজের (mortgage) সুযোগ দিয়েছিল। হাঙ্গেরীয় ফোরিন্ট এবং সুইস ফ্র্যাঙ্ক। মর্টগেজ হচ্ছে ঋণের বিপরীতে ব্যাংকের ডকুমেন্টস। অর্থাৎ আপনি যদি ব্যাংক থেকে ঋণ নেন, ব্যাংক একটা ডকুমেন্টস দেবে, যেখানে লেখা থাকবে আপনি কত ঋণ নিয়েছেন, কী বাবদ নিয়েছেন, কবে নাগাদ পরিশোধ করবেন, কতটুকু সুদ-সহ পরিশোধ করবেন ইত্যাদি। এই ডকুমেন্টসটাকে মর্টগেজ বলা হয়। যেদিন আপনি ঋণ পরিশোধ করবেন, সেটাকে বলা হয় ম্যাচুরিটি ডেট। অর্থাৎ ঋণ শোধের শেষ সীমা।

কখনো কখনো ব্যাংক এই মর্টগেজ তৃতীয় কোনো পক্ষের নিকট বিক্রি করে দেয়। যেমন আমি ব্যাংক থেকে ১ লাখ টাকা লোন নিলাম, যা এক বছর পর পরিশোধ করব, অর্থাৎ ম্যাচুরিটি ডেট এক বছর পর। ১০% অতিরিক্ত দিতে হবে। মোট ১ লাখ ১০ হাজার। কিন্তু কোনো কারণে ছয় মাস পর ব্যাংকের নগদ টাকা প্রয়োজন, এখন সে কী করবে? সে তৃতীয় কোনো ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট আমার মর্টগেজটা বিক্রি করে দেবে। হয়তো ১ লাখ ৩ হাজার টাকায়। ফলে

ব্যাংকের সুবিধা হলো সে নগদ টাকা পেয়ে গেল, সাথে কিছু লাভও পেল। যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আমার মর্টগেজ কিনে নিলো তার লাভ হচ্ছে সে ১ লাখ ৩ হাজার টাকা দিয়ে ছয় মাস পর ১ লাখ ১০ হাজার টাকা পাবে। ম্যাচুরিটি ডেটের ওপর নির্ভর করে মর্টগেজের দামের তারতম্য হয়।

তো ফ্র্যাঙ্ক ঋণ নিলে সুদ দিতে হবে ২%। পক্ষান্তরে ফোরিন্ট ঋণ নিলে সুদ দিতে হবে ৯%। ফলে সবাই ফ্রাঙ্কই নিয়েছে। তাদের বিশ্বাস ছিল ফ্রাঙ্ক ও ফোরিন্টের এক্সচেঞ্জ রেট এখন যেমন আছে, তেমনই থাকবে। কিন্তু হঠাৎ ফোরিন্টের দাম কমে যায়। ফলে সুদের হার অনেক বেড়ে যায়। কারণ তারা নিয়েছে ফ্রাঙ্ক, পরিশোধও করতে হবে ফ্রাঙ্ক অথবা ফ্রাঙ্কের সমমূল্যের ফোরিন্ট। এখন ফ্রাঙ্ক কিনে সেটা পরিশোধ করুক কিংবা ফ্রাঙ্কের সমমূল্যের ফোরিন্ট পরিশোধ করুক, সর্বাবস্থায় অনেক বেশি ফোরিন্ট ব্যয় করতে হবে। যা ছিল স্থানীয় মানুষের আয়ক্ষমতার বাইরে। ফলে ঋণখেলাপির সংখ্যা আকাশচুম্বী হয়ে যায়।

এ সময় হাঙ্গেরীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রচুর পরিমাণ ফ্রাঙ্কের প্রয়োজন হয়। স্থানীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যকার লেনদেন সচল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদেরকে ফ্রাঙ্ক দিতে হবে। পাবে কোথায়?

ভরসাস্থল আইএমএফের সেই ট্রেডিং বুথ। তারা গিয়ে হয়তো বলবে—এসডিআরের পরিবর্তে আমাকে ডলার দাও। এখন আইএমএফ দেখবে কে? হাঙ্গেরির এসডিআর কিনে নিয়ে পরিবর্তে ডলার দিতে রাজি। হয়তো চীন এগিয়ে এসে বলবে আমি রাজি। চীন থেকে ডলার নিয়ে হাঙ্গেরিকে দেবে, হাঙ্গেরির এসডিআর চীনকে দিয়ে দেবে। তারপর হাঙ্গেরি ডলার ভাঙিয়ে ফ্রাঙ্ক কিনে নেবে। কিংবা কারও কাছে যদি ফ্রাঙ্ক থাকে, আর সে হাঙ্গেরির এসডিআরের বিনিময়ে ফ্রাঙ্ক দিতে রাজি থাকে, তাহলেও কাজ চলবে।

এখন আমাদের আসল কথায় ফিরে আসি।

তারল্য সংকট ব্যতীত আইএমএফ এসডিআর ইস্যু করে না। বিশ্বের পরবর্তী তারল্য সংকট যে মাত্রায় হবে তা সামাল দেওয়ার মতো ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা ফেডারেল রিজার্ভগুলোর নেই। শেষ ভরসাস্থল আইএমএফ এবং এসডিআর। কিন্তু গোটা বিশ্বের সংকট সামাল দিতে যে পরিমাণ এসডিআর ইস্যু করতে হবে, তার বিপরীতে একমাত্র আশ্রয় হচ্ছে আইএমএফের হার্ড এসেট বা বাস্তব সম্পদ। স্বর্ণও এই হার্ড এসেটের অন্তর্ভুক্ত। ঝানু বিনিয়োগকারী এবং চীন-রাশিয়ার মতো আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়রা এই বিষয়টি মাথায় রেখেই তাদের বিনিয়োগ পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন।

তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়—যদি আইএমএফ এবং এসডিআরের ওপরও মানুষ কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলে? আপাতত এরপর আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এখনো পর্যন্ত আইএমএফই শেষ ভরসা। এর ওপরে যাওয়া সম্ভব না। এ ক্ষেত্রে আইএমএফের পুঁজি তাদের হাতে থাকা ৩ হাজার টন স্বর্ণ এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় মিত্রদের হাতে থাকা স্বর্ণ।

এই কারণেই আমি সবসময় ঘুরেফিরে স্বর্ণের কথা বলি এবং গোল্ড টু মানি রেশিও, গোল্ড টু জিডিপি রেশিও হিসাব করি। পাশাপাশি ডলারের দাম ধরি প্রতিআউন্স ১০ হাজার ডলার বা তার বেশি। কোনো কারণে যদি ন্যাশনাল কারেন্সির ওপর আস্থা হারিয়ে যায়, এবং তদস্থলে অন্য কোনো বিহিত মুদ্রা ব্যবহার করে সিস্টেমকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়, তবে কোনটা ভরসা? একমাত্র ভরসা এসডিআর। তবে তা আদৌ কাজ করবে কি না নিশ্চিত না। যদি করে, তবে দুই কারণে করবে। প্রথমত কেউই এসডিআর বুঝে না। দ্বিতীয়ত এসডিআর আমাদের পকেটে নেই। জনসাধারণ এসডিআর ব্যবহার করে না, করে রাষ্ট্র। আমাদের কেউ এখনো এসডিআর চোখে দেখেনি, যদিও এ যাবৎকালের সবচেয়ে টেকনিক্যাল এবং বিমূর্ত মুদ্রা এটি।

ফলে যদি এসডিআর অর্থনীতি বাঁচাতে পারে, এর কারণ হচ্ছে স্বল্প কজন ছাড়া আর কেউ এটি বুঝে না। যদি জনসাধারণ এটি বুঝে ফেলে, এতে তারা আস্থা হারিয়ে ফেলার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। তখন? তখন একমাত্র ত্রাতা স্বর্ণ। নাথিং এলস।

শ্যাডো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড

বিশ্বের সব দেশ তাদের রিজার্ভে বহুমাত্রিকতা আনয়নের জন্য স্বর্ণ সংগ্রহে মনোনিবেশ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোজোন, আইএমএফের হাতে আগে থেকেই প্রচুর স্বর্ণের মজুত রয়েছে। সাথে এখন অন্যান্য দেশ যুক্ত হওয়ায় এই প্রক্রিয়াকে শ্যাডো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

শ্যাডো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড পরিমাপের সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে গোল্ড টু জিডিপি রেশিও পরিমাপ করা। প্রতিটি দেশের অফিশিয়াল স্বর্ণের সাথে মিলিয়ে গোল্ড টু জিডিপি রেশিও বের করা কঠিন কিছু নয়। এভাবে খুব সহজেই বের করা যায় বিশ্বের বেশিরভাগ স্বর্ণ কোথায় 'বসবাস' করে।

ইউরোজোনের ১৯টি দেশের গোল্ড টু জিডিপি রেশিও সবচেয়ে বেশি, প্রায় চার পার্সেন্টের বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের রেশিও ১.৭%। মজার ব্যাপার হচ্ছে রাশিয়ার রেশিও ২.৭%। যদিও রাশিয়ার ইকোনোমি যুক্তরাষ্ট্রের আট ভাগের এক ভাগ, এবং

রাশিয়ার স্বর্ণের মজুতও যুক্তরাষ্ট্রের আট ভাগের এক ভাগ, কিন্তু জিডিপির আকার ছোট হওয়ার কারণে তাদের রেশিও বেশি। রাশিয়া সেসব দেশের একটি, যারা স্বর্ণ মজুতে সিরিয়াস। উদ্দেশ্য হচ্ছে ইউরোজোনের সমান হওয়া। জাপান, কানাডা এবং যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি যদিও অনেক বড়, কিন্তু তাদের রেশিওর অবস্থা শোচনীয়, এক পার্সেন্টেরও কম। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ফিগার হচ্ছে—চীন। সবসময়ের মতো। ২০১৫ সালের জুলাইতে প্রকাশিত অফিশিয়াল রিপোর্ট অনুসারে তাদের স্বর্ণের মজুত ১৬৫৮ টন। কিন্তু খনি থেকে স্বর্ণ উত্তোলন এবং আমদানির নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে তাদের স্বর্ণের মজুত প্রায় ৪ হাজার টন।

আমি রিফাইনারি এবং লজিস্টিক ফার্মগুলোর সঙ্গে কথা বলেছি, যারা বাস্তবে স্বর্ণ সামলানোর দায়িত্বে আছে। পাশাপাশি কথা বলেছি সরকারি কর্মকর্তাদের সাথেও। সব মিলিয়ে উপর্যুক্ত পরিমাণ যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। কমপক্ষে তাদের নিকট এই পরিমাণ স্বর্ণ আছে। ৪ হাজার টনের বেশি থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাশিয়ার মতো চীনও ইউরোজোনের সমান হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে স্বর্ণ সংগ্রহ করে যাচ্ছে।

স্বর্ণের এই মজুত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আসন্ন অর্থব্যবস্থা ধসের পর মজুত স্বর্ণই ভবিষ্যৎ-খেলার নীতিমালা নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করবে। পূর্বে যেমন বলেছি অর্থব্যবস্থা ধসের পর নেতারা টেবিলে গোল হয়ে বসবে। সেখানে প্রত্যেকের সংগ্রহে থাকা স্বর্ণের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবে কার স্বর কতটুকু 'উঁচু' হবে। পুনরায় উল্লেখ্য—পৃথিবীতে অফিশিয়াল স্বর্ণের পরিমাণ মাত্র ৩৫ হাজার টন।

বিগত সাত বছরে চীন ৩ হাজার টন স্বর্ণ সংগ্রহ করেছে। এর অর্থ হচ্ছে তারা বিশ্বের অফিশিয়াল স্বর্ণের প্রায় ১০ ভাগের মালিকানা নিয়ে নিয়েছে। তবে এদের ক্রয়নীতিমালা অস্পষ্ট। যদি তারা সুস্পষ্টভাবে তাদের ইচ্ছা ও হাতে থাকা স্বর্ণের পরিমাণ প্রকাশ করে, এক লাফে স্বর্ণের দাম বেড়ে যাবে। অস্বচ্ছ মার্কেটে সবসময় এমনই হয়ে থাকে। তবে চীন তাদের স্বর্ণ সংগ্রহ সম্পূর্ণ করার আগপর্যন্ত প্রকৃত মজুত প্রকাশ করবে না, কারণ তারা চাচ্ছে তাদের কেনাকাটা শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দাম সর্বনিম্ন থাকুক।

চীন পর্যাপ্ত পরিমাণ স্বর্ণ মজুত করতে চাচ্ছে। কারণ ভবিষ্যৎ-আলোচনার টেবিলে তারা 'প্রধান অতিথি'র আসনে থাকতে চায়। কানাডা, অস্ট্রিয়া, যুক্তরাজ্য—তাদের 'নিম্নবিত্ত' গোল্ড টু জিডিপি রেশিওর কারণে টেবিল থেকে বহু দূরে থাকবে, একদম দেয়াল লাগোয়া ব্যাকবেঞ্চার। এসব ছোট 'স্বর্ণশক্তিগুলো' দর্শকসারিতে থাকবে। আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়া, চীন খেলার কী নিয়ম আবিষ্কার করে তা দেখেই তুষ্ট থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে জার্মানি কথা বলবে ইউরোপের পক্ষে।

ফলে খেলার পক্ষগুলো হবে আমেরিকা, জার্মানি, রাশিয়া, চীন। রেফারি থাকবে আইএমএফ। স্বর্ণের মজুতদাররা সেভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছে। শ্যাডো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বলতে আমি এটিই বুঝিয়ে থাকি।

উপসংহার

অর্থনীতিবিদ আর নীতিনির্ধারকরা যতই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করুক না কেন—স্বর্ণই অর্থ। ছিল এবং থাকবে। ফ্রান্স ১৯৭৫ সালে আইএমএফে অফিশিয়াল স্বর্ণের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য চাপাচাপি করেছিল। অথচ তখন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অতীত। অ্যাকাডেমিক ইকোনোমিস্টরা স্বর্ণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। এবং মনিটরি সিস্টেম অধ্যয়নের সময় স্বর্ণকে গোনায়ও আনেন না। যদিও পর্দার অন্তরালে স্বর্ণই কলকাঠি নাড়ে। বৈশ্বিক রিজার্ভগুলোর প্রাণ এখনো স্বর্ণ, ভবিষ্যতে এর গুরুত্ব বাড়বে বৈ কমবে না। ভবিষ্যৎ-বিশ্ব অর্থব্যবস্থা বুঝতে স্বর্ণের বোঝাপড়া অপরিহার্য।

* * *

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বর্ণই ইনস্যুরেন্স

পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে স্বর্ণ ইনভেস্ট নয়, পণ্য নয়, কাগুজে চুক্তি নয়, ডিজিটাল নয়। এটি বাস্তব সম্পদ, এ্যাটমিক নাম্বার ৭৯। বর্তমান জটিল (কমপ্লেক্স) অর্থব্যবস্থার বিপরীতে সাদাসিধা সম্পদ। অর্থব্যবস্থার ধসে নিরাপদ সুরক্ষাবর্ম। যেহেতু স্বর্ণ সাদাসিধা বাস্তব সম্পদ (এন্টি কমপ্লেক্স), তাই বিনিয়োগকারীদের উচিত এই জটিল অর্থব্যবস্থায় স্বর্ণ সংগ্রহ করে রাখা। কমপ্লেক্সিটি (জটিলতা) বলতে আমি কী বোঝাচ্ছি তা নিয়ে আলাপ করা যাক এবং এই কমপ্লেক্স সিস্টেমের রিস্ক মোকাবিলায় স্বর্ণ কীভাবে আমাদের সহায়তা করবে সেটাও বুঝে নেওয়া যাক।

কমপ্লেক্সিটি মডেল এবং সিস্টেম এনালিসিস

বর্তমান অর্থব্যবস্থা, বিশ্ব-অর্থনীতি এবং অর্থব্যবস্থার সম্ভাব্য পতন এনালিসিস করার সময় আমি কমপ্লেক্সিটি মডেল ব্যবহার করে থাকি। পক্ষান্তরে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যবহার করে স্টকাস্টিক ইকুইলিব্রিয়াম মডেল (Stochastic equilibriuam model), যা আদৌ বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে না।

কমপ্লেক্সিটি ফিজিক্সের একটি শাখা। যা নিবিড়ভাবে সংযুক্ত নেটওয়ার্কের রিকার্সিভ ফাংশন (এটি প্রোগ্রামিং-এর একটি পরিভাষা। যার সাদামাটা অর্থ হচ্ছে, ছোট ছোট সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে বৃহত্তর সমস্যা সমাধান করা) ব্যাখ্যা করতে পারে। সোজা কথায় সমস্যার শেকড়গুলো কীভাবে পরস্পর সংযুক্ত হয় এবং কাজ করে, তা ব্যাখ্যা করা। একাধিক শেকড় একসঙ্গে হয়ে যখন কাজ করে, তখন সমস্যাগুলোর আচরণে পরিবর্তন আসতে পারে, অর্থাৎ একাকী থাকাকালে একটা প্রব্লেম যেভাবে কাজ করে, আরও অনেকগুলো প্রব্লেমের সাথে যখন সংযুক্ত হয়, তখন এটি সেভাবে কাজ করে না। বরং নতুন ধরনের আচরণ করতে পারে, একে বলা হয় এডপ্টিভ বিহ্যাভিয়র। এই এডপ্টিভ বিহ্যাভিয়র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল আসতে পারে। সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল কী হতে পারে সেসবের ব্যাখ্যা প্রদানই কমপ্লেক্সিটি মডেলের কাজ।

যা-ই হোক, কমপ্লেক্সিটি মডেল বোঝার পর এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম মডেল কী? এসব থিয়োরিটিক্যাল কচকচানি অনেকের বিরক্তি উদ্রেক করতে পারে। তাই চলুন সহজ একটা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করি।

ধরুন একটা বিমান। অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল, অন্যান্য ভারী ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত হওয়া সত্ত্বেও এটি শূন্যে উড়তে পারে। কীভাবে? উত্তর হচ্ছে বিমানকে একটি সুনির্দিষ্ট আকৃতিতে, সূক্ষ্ম ইঞ্জিনিয়ারিং গাইডলাইন মেনে তৈরি করা হয়েছে।

এর পাখার উপরাংশ বাঁকানো, নিচের অংশ সমতল। ফলে নিচের অংশ দিয়ে অধিক বাতাস চলাচল করতে পারে, যা তাকে শূন্যে ভেসে থাকতে সহায়তা করে। গতি কীভাবে পায়? ওকে। গতি প্রদানের জন্য আছে ইঞ্জিন। ইঞ্জিন একে গতি দেয়, পাখার শেপ ভেসে থাকতে সহায়তা করে। পাশাপাশি যদি কখনো বাঁক নিতে হয়? সেজন্য আছে রাডার। এরকম আরও বহু প্রকৌশলবিদ্যা প্রয়োগের পর বিমান শূন্যে চলতে সক্ষম। ককপিটে বসে থাকা পাইলট যদি মনে করে বিমানের গতি বাড়ানো দরকার, সে থ্রটল ব্যবহার করবে। যদি মনে করে বাঁক নেওয়া প্রয়োজন রাডারের সহায়তা নেবে। এভাবেই সে বিমান নিয়ন্ত্রণ করবে।

এবার ধরুন অর্থনীতি হচ্ছে একটা বিমান। ওয়াশিংটনের বোর্ডরুমে বসে থাকা ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান হচ্ছে পাইলট। যদি সে মনে করে তার বিমানতুল্য অর্থনীতি ঠিকঠাক গতি পাচ্ছে না, সে থ্রটল চাপবে—প্রিন্টিং প্রেসে ডলার ছেপে তাতে একটু গতি সঞ্চার করবে। আরও যা যা সমস্যা দেখা দেবে, এভাবেই বিভিন্ন উপায়ে তা সমাধান করার চেষ্টা করবে। এটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম মডেল বা স্বাভাবিক স্থিতাবস্থা।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অর্থনীতি ইকুইলিব্রিয়াম সিস্টেম নয়, এটি কমপ্লেক্স সিস্টেম। তাহলে কমপ্লেক্সিটি কী? ধরুন, আপনি তো বিমান নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা মেকানিজম সেট করে রেখেছেন। কিন্তু হঠাৎ আপনার বিমানটা প্রজাপতি বনে গেল! তখন? থ্রটল চাপলে কাজ হবে? কমপ্লেক্সিটির ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হয়, যাকে অ্যাকাডেমিক ভাষায় বলা হয় 'ইমার্জেন্ট প্রোপার্টি'। ইমার্জেন্ট প্রোপার্টি হচ্ছে এমন পরিস্থিতি যা অত্যাসন্ন, কিন্তু আপনি তা দেখতে পাবেন না। ফলে যদিও ফেড অর্থব্যবস্থার টুলগুলো ব্যবহার করে অর্থনীতিরূপী বিমান চালিয়ে নিচ্ছে, যখন কমপ্লেক্সিটি তৈরি হবে, এসব টুলস কোনো কাজে আসবে না। বিমান তখন অনাকাঙ্ক্ষিত বাঁক নিতে শুরু করবে।

আমাদের ব্যাংকিং সিস্টেমের দিকে তাকান। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর ত্রুটিগুলো সারানো হয়নি। লেপন করা হয়েছে মাত্র। যেসব কারণে মন্দা দেখা দিয়েছিল, সেগুলোও দূর করা হয়নি। আপনি টিভি ভাষ্যকার আর

নীতিনির্ধারকদের বলতে শুনবেন যে ব্যাংকগুলোর ব্যালন্স শিট এখন অনেক স্ট্রং, তাদের 'ক্যাপিটাল রেশিও' উত্তুঙ্গে। সবই সত্য। কিন্তু সব সত্যের পর সত্য হচ্ছে ব্যাংকগুলো এখনো সম্ভাব্য রিস্ক মোকাবিলায় যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। পুরো সিস্টেমটা অস্থিতিশীল। আমেরিকার বড় বড় পাঁচটা ব্যাংক ২০০৮ সালের চেয়ে এখন ঢের বড়। তাদের সম্পদের হার অনেক বেশি। ২০০৮ সালে যে ব্যাংকগুলো 'সম্ভাব্য পতন মোকাবিলায় যথেষ্ট' বড় ছিল (তা সত্ত্বেও দিশা হারিয়ে খাবি খেয়েছে এবং দেউলিয়াত্বের দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিল), সেগুলো এখন আরও বড়, এবং অধিকতর ভয়ংকর।

কেন? কারণ যদি অধিকাংশ সম্পদ গুটিকয়েক ব্যাংকের হাতে জমা হয়, এবং সব ধরনের ব্যবসা তাদের পরস্পরের মধ্যেই চলে, এখানে উচ্চমাত্রার 'ডেনসিটি' (নিবিড়তা/নির্ভরশীলতা) তৈরি হবে। যার অর্থ হচ্ছে—যদি এই সিস্টেমের কোথাও ছোটখাটো কোনো সমস্যাও তৈরি হয়, তা গোটা সিস্টেমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। একে 'কন্টাজিয়ন' বা সংক্রমণ বলা হয়। আইএমএফের ভাষায় 'স্পিলওভার'। যে নামেই ডাকেন না কেন, সারকথা হচ্ছে এটি গোটা সিস্টেমকে ক্রমান্বয়ে রোগাক্রান্ত করে ফেলবে।

কমপ্লেক্স সিস্টেমের সবচেয়ে ভীতিকর দিক হচ্ছে সমস্যার সূচনাবিন্দুতে ছোটখাটো পরিবর্তনও ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। বড় বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে এখানে বড়সড় 'কারণের' দরকার হয় না। তুচ্ছ তুচ্ছ কারণ, যেমন পৃথিবীর দূরতম কোনো প্রান্তে অনুল্লেখ্য কোনো ব্রোকারের অনাকাঙ্ক্ষিত পতনও গোটা সিস্টেমের পতন ঘটাতে পারে—সিস্টেমের নিবিড়তা ও সময়ভেদে।

একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক। ধরুন, কোনো খাড়া পর্বতচূড়ায় একটি তীক্ষ্ণ পাথর আছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে সেখানে তুষার জমছে। বাহ্যত সেখানে তুষারধসের কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এক্সপার্টরা ঠিকই ধরতে পারবেন যে তুষারগুলো ভয়ংকরভাবে হেলে আছে, হালকা বাতাসেও ধসে পড়তে পারে। কিন্তু বাস্তবে তুষারধস ঘটছে না। স্কিয়াররা সেখানে মনের সুখে স্কিইং করে বেড়াচ্ছে। বেশ চমৎকার মনোরম দৃশ্য।

হঠাৎ একদিন একটি তুষারকণা পর্বতচূড়ায় আঘাত করল, আশেপাশের আরও কয়েকটা কণা জায়গা থেকে সরিয়ে দিলো। ছোট্ট একটা তুষারধারা তৈরি হলো। কিন্তু নিচে নামতে নামতে, আশেপাশের তুষারকণা গিলে নিয়ে শক্তি-সঞ্চয় করতে করতে যতক্ষণে এটি খাদ বেয়ে নিচে নেমে এসেছে, ভয়াবহ তুষারধসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ের প্রান্ত ভেঙে ভেঙে পড়ছে। তীব্র জলস্রোতে স্কিয়াররা তো বটেই, তলদেশের গ্রামও ভেসে গেছে।

ঘটনার অনন্তভার পড়ল আপনার কাঁধে। আপনি কাকে দায়ি করবেন? সেই প্রথম তুষারকণাকে নাকি তুষারগুলোর অনিশ্চিত অস্থিতিশীল হেলে থাকাকে? অবশ্যই তুষারগুলোর অস্থিতিশীল অবস্থাকে। কারণ সেই প্রথম তুষারকণা তো একটি উপলক্ষ্য মাত্র, আগে হোক পরে হোক, তুষারের কারণে হোক বা ভিন্ন কারণে, তুষারধস হতোই। কারণ গোড়ায় গলদ ছিল। পর্বত ধসে পড়ার অপেক্ষাতেই ছিল।

আরেকটি উদাহরণ দেখি। ধরুন আপনি কোনো থিয়েটারে বসে মনমুগ্ধকর কোনো অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন। হঠাৎ দুজন লোক উঠে দৌড়ে বের হয়ে গেল। আপনি কি করবেন? আপনি হয়তো ভাববেন তাদের কোনো তাড়া আছে নিশ্চয়। কিন্তু ধরুন, দুজন না উঠে, ৬০ জন লোক একসঙ্গে দৌড় দিলো, তখন আপনি কি করবেন? আশা করা যায় আপনিও দৌড় লাগাবেন। কেন? কারণ এখন আপনি ভাববেন নিশ্চয় এমন কিছু ঘটেছে যা তারা জানে কিন্তু আমি জানি না। হতে পারে আগুন লেগেছে। তারপর কী হবে? পুরো থিয়েটারে ধাক্কাধাক্কি লেগে যাবে।

এইযে প্রথমে দুজন গেল, আপনি ঠায় বসে রইলেন। কিন্তু ৬০ জন দৌড় দেওয়ার পর আপনিও দৌড়ে অংশ নিলেন, একে বলে এডপ্টিভ বিহ্যাভিয়র। তাদের দৌড়ে আপনি প্রভাবিত হয়েছেন, আপনার স্বাভাবিক অনুষ্ঠান উপভোগ ব্যাহত হয়েছে। এখন ঠিক কতজন দৌড় দিলে আপনিও দৌড় দেবেন, তা অনিশ্চিত। হতে পারে ১০ জন, হতে পারে ২০ জন। হতে পারে ১০০ জন দৌড় দেওয়ার পরও আপনি বসেই থাকবেন।

একে বলা হয় 'ক্রিটিক্যাল থ্রেজল্ড'। ক্রিটিক্যাল থ্রেজল্ড অর্থ হচ্ছে সেই বিন্দু বা সেই পরিস্থিতি, যেখানে অন্যদের আচরণ আপনার আচরণকে প্রভাবিত করে। এখন ঠিক কতজন হলে আপনি প্রভাবিত হবেন, তা পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল থ্রেজল্ড পরিবর্তনশীল। থিয়েটারে বসা প্রত্যেকের ক্রিটিক্যাল থ্রেজল্ড ভিন্ন ভিন্ন। কেউ হয়তো ১০ জনকে দেখে প্রভাবিত হবে, আবার কেউ শতজনকে দেখেও প্রভাবিত হবে না।

এবার পুঁজিবাজারের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। থিয়েটারের মতো কয়েকশ না; বরং বিশ্বজুড়ে মিলিয়ন মিলিয়ন বিনিয়োগকারী প্রতিদিন, প্রতিঘণ্টায়; বরং প্রতিমুহূর্তে কেনাবেচা করছে। পুঁজিবাজারে লেনদেন করছে, বৈদেশিকমুদ্রা কেনাবেচা করছে, অন্যান্য পণ্য লেনদেন করছে। আপনি যদি স্টকমার্কেটে বিনিয়োগকারী হয়ে থাকেন, তবে দাম কমতে দেখলে আপনি হয়তো ভাববেন এইতো কেনার সুযোগ! আরেকটু কমলে আপনি হয়তো ভাববেন আরে, দাম পড়ছে কেন! আরও কমলে? আপনি হয়তো থিয়েটারের মতো আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন। কিন্তু ঠিক কতটুকু দাম পড়লে আপনি আতঙ্কিত হতে শুরু করবেন? আপনি আপনার শেয়ার বেচে দিলেন, এতে কি সমস্যার সমাধান হবে? না। বরং হতে পারে অন্যান্য শেয়ার

হোল্ডাররাও তাদের শেয়ার বিক্রি করতে শুরু করবে। সামান্য দরপতন থেকে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। এটিই হচ্ছে অর্থব্যবস্থায় কমপ্লেক্সিটি মডেল। এটি বুঝতে পারলে আপনি বিনিয়োগের অনেক ঝুঁকি সম্পর্কে অগ্রিম সতর্ক হতে পারবেন।

অর্থনীতি বিমানের মতো নয় যে এটা হয়েছে, ওটা চাপ। এখানে রয়েছে কমপ্লেক্সিটি থ্রেজল্ড। কখন কে প্যানিকড হবে, কেন হবে, কেউ জানে না। ফলে অর্থব্যবস্থা ইকুলিব্রিয়াম মডেলে বিচার করা যায় না, কমপ্লেক্সিটি মডেলে করতে হয়।

যতদিন ফেডারেল রিজার্ভ ইকুইলিব্রিয়াম মডেল আঁকড়ে পড়ে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তারা বহু বাবলস মিস করে যাবে, সিস্টেমিক রিস্কগুলোকে অবজ্ঞা করতে থাকবে, যেমনটা বিগত ৩০ বছর ধরে বারবার করে আসছে। ভুল মডেল অনুসরণের ক্ষতি আপনি গাদা গাদা পিএইচডিওয়ালা আর অতীব 'উচ্চ শিক্ষিত'দের দিয়ে পোষাতে পারবেন না। কখনোই না। ভুল মডেল বারবার ভুল ফলাফলই দেবে। যতক্ষণ না আপনি মডেল চেঞ্জ করছেন।

আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক

কমপ্লেক্সিটি মডেল শুধু যুক্তরাষ্ট্রের জন্যই প্রযোজ্য নয়; বরং বিশ্ব-অর্থব্যবস্থারও সমান গুরুত্ববহ। কারণ পুঁজিবাজার ইকুইলিব্রিয়াম নয়, কমপ্লেক্স। বিশ্বের প্রত্যেকটা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ম্যাক্রো মডেল (বৃহৎ সামগ্রিক মডেল) ত্রুটিপূর্ণ এবং অস্পষ্ট।

এটি অবশ্য নতুন না। ১৯৮৭ সালে একদিনেই স্টকমার্কেটের পতন হয়েছে ২২%। যা আজকের ৪০০০ (৪ হাজার) ডো পয়েন্টের (Dow Points) সমতুল্য! এক দিনে ৪ হাজার পয়েন্ট (এক পয়েন্ট সমান এক ডলার) পতন! ভাবতে পারেন? হ্যাঁ, এটিই ঘটেছিল ১৯৮৭ সালে। ১৯৯৭ সালে এশিয়াতে, ১৯৯৮ সালে দীর্ঘমেয়াদি পুঁজিধস, ২০০০ সালে টেক স্টকের পতন, ২০০৭ সালে এবং ২০০৮ সালের ভীতিকর অবস্থা। বারবার কেন হচ্ছে এসব?

কারণ ফেডারেল রিজার্ভ ককপিটে বসে বসে বিমান চালাচ্ছে। তাদের খবরও নেই যে অর্থব্যবস্থা বিমান নয়, এটি কমপ্লেক্স। যতদিন 'বিমান বিমান' খেলা বন্ধ না হবে, ততদিন এমন ঘটতেই থাকবে। আমি কীভাবে এত নিশ্চিত যে এটি কমপ্লেক্স, পরস্পর সংযুক্ত এবং স্পিলওভার ইফেক্টযুক্ত? সহজ। এটি যেকোনো নেটওয়ার্কেরই বৈশিষ্ট্য। বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থা পরস্পর কতটা সংযুক্ত, বাস্তব জীবনে তা অনুধাবন করা কষ্টকর। কয়েকটা সাদামাটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই।

২০০০ সালে আমেরিকান ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার কমিয়ে মাত্র এক পার্সেন্টে নিয়ে আসে। আশা ছিল এতে করে মানি সার্কুলেশন বাড়বে। কারণ সুদহার কম থাকলে মানুষ ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে উদ্‌বুদ্ধ হবে। হয়েছেও তাই। মানুষ ব্যাপকভাবে হাউজ লোন নিতে শুরু করে। কিন্তু হাউজ লোনই কেন? যেহেতু সুদের হার কম, যারা ব্যাংকে টাকা রাখে, ইনভেস্টররা, তারা রাখতে আগ্রহী হয়নি। মাত্র এক পার্সেন্ট লাভের জন্য ব্যাংকে টাকা দিয়ে পোষাবে না। ফলে তারা নতুন বিনিয়োগ ক্ষেত্র খুঁজতে শুরু করে।

লোভনীয় ক্ষেত্রে সামনে আসে হাউজিং সেক্টর। পুঁজিপতিরা সেখানে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ঢালতে শুরু করে। ওদিকে সাধারণ মানুষ ব্যাংক থেকে মাত্র এক পার্সেন্ট সুদে হাউজ লোন নিয়ে বাড়ি কিনতে শুরু করে। আমরা পূর্বে মর্টগেজের কথা বলেছিলাম। আমেরিকাতে হাউজ লোন নিলে ব্যাংক একটা মর্টগেজ ইস্যু করে দেয়। যেখানে ঋণের পরিমাণ, দিন, তারিখ ইত্যাদি লেখা থাকে। যে লোন নিয়েছে, সে যদি লোন পরিশোধ করতে না পারে, তবে মর্টগেজ যার হাতে থাকবে, সে বাড়ির মালিক হয়ে যাবে। যদি ব্যাংকের হাতে থাকে, তো ব্যাংক বাড়ির মালিক হয়ে যাবে।

কিন্তু সাধারণত হাউজ লোনের মর্টগেজ ব্যাংকের হাতে থাকে না। তারা বিক্রি করে দেয়। এবং প্রচুর বিক্রি হয়। মাসে মাসে মর্টগেজের হাত বদল হওয়াও অস্বাভাবিক কিছু না। মর্টগেজ ক্রেতার কোনো লস নেই। হয়তো সে লোন গ্রহীতা থেকে টাকা পাবে, নয়তো বাড়িটা পেয়ে যাবে। সে সময় সুদহার কম থাকার কারণে ব্যাংকের হাতে হাজার হাজার মর্টগেজ জমা হয়েছে, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকগুলো এসব মর্টগেজ কিনে নিতে শুরু করে।

ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক হচ্ছে বড় বড় ব্যাংক। সাধারণ ব্যাংকগুলো হচ্ছে কমার্শিয়াল ব্যাংক। এগুলো ব্যক্তি ও ছোট থেকে মাঝারি প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করে থাকে। কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক কাজ করে রাঘব বোয়ালদের সাথে। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকগুলোর একটা কাজ হচ্ছে বড় বড় প্রোপার্টি কিনে নিয়ে সেগুলো বিলিওনিয়ার ইনভেস্টরদের নিকট বিক্রি করে দেওয়া। ব্যাংক এ ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে এবং মোটা অঙ্কের মুনাফা কামায়।

তো কমার্শিয়াল ব্যাংকের মর্টগেজগুলো ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক কিনে নিয়ে সেগুলোর একটি প্যাকেজ তৈরি করে। কারণ আলাদা আলাদা একটা একটা করে মর্টগেজ বিক্রি করে তাদের পোষায় না, এটা তাদের কাজও না। তারা বড় বড় লেনদেন করে। মর্টগেজের এই প্যাকেজের নাম দেয় সিডিও বা Collaterallized Debt Obligation. এগুলো তারা তাদের ক্লায়েন্টের নিকট বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা

কামাচ্ছিল। ফলে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর নিকট আরও মর্টগেজ কেনার আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর নিকট তো অত মর্টগেজ নেই।

এ সময় তারা হাউজ লোন সহজ করে দেয় যেন আরও বেশি মানুষ লোন নেয় এবং কমার্শিয়াল ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের নিকট আরও বেশি মর্টগেজ বিক্রি করতে পারে। সবারই লাভ। সাধারণ মানুষ সহজ সুদে ঋণ নিয়ে বাড়ি কিনতে পারছে, কমার্শিয়াল ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের নিকট মর্টগেজ বিক্রি করে লাভ করতে পারছে। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক আবার সেগুলো একত্র করে সিডিও বানিয়ে তাদের ক্লায়েন্টের নিকট বিক্রি করে মুনাফা পাচ্ছে। হাউজ লোন সহজ করতে গিয়ে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো নতুন একধরনের ঋণ প্রবর্তন করে, এর নাম দেয় সাব-প্রাইম লোন।

সাধারণত হাউজিং লোন প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো কঠোর হয়ে থাকে, কারণ হাউজ লোন অনাদায়ের হার অনেক বেশি। তাই ব্যাংক লোন দেওয়ার পূর্বে ঋণগ্রহীতার পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক খোঁজখবর নেয়। এবং হাউজ লোন নিতে হলে অবশ্যই তার স্থায়ী ইনকামের ব্যবস্থা থাকতে হয়। কিন্তু সাব-প্রাইম লোনের ক্ষেত্রে এ সবকিছু শিথিল করে দেওয়া হয়। ফলে এমন লোকেরাও লোন পেতে শুরু করে যাদের লোন পরিশোধের সক্ষমতা আদৌ নেই। লোনের মর্টগেজ যথারীতি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকগুলো কিনে নিয়ে সিডিও করে সেগুলো ইনভেস্টরদের নিকট বিক্রি করছিল।

চক্র এখানেই শেষ নয়। যেসব ইনভেস্টররা সিডিও কিনছিল, তারা আবার এসব সিডিওর বিপরীতে বিমা করতে শুরু করে। বিমা হলো, ধরুন আপনি একটা গাড়ি কিনেছেন, যেকোনো মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্ট করে স্বপ্নের গাড়িটা দুমড়েমুচড়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে আপনি যদি কোনো বিমা কোম্পানিতে গাড়ির ওপর একটা বিমা খুলে রাখেন, তাহলে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সেই কোম্পানিকে দিতে হবে। এবং বিনিময়ে যদি কখনো আপনার গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারা ক্ষতিপূরণ দেবে।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমা কোম্পানি হচ্ছে আমেরিকান এআইজি। সে সময় তারা সিডিওর ওপর বিমা দিতে শুরু করে। ফলে ইনভেস্টররা তাদের সিডিওর বিপরীতে বিমা খুলতে আরম্ভ করে। কোনো কারণে যদি সাব-প্রাইম লোনগ্রহণকারীরা দেনাশোধে ব্যর্থ হয়, বিমা কোম্পানি থেকে ইনভেস্টররা যেন ক্ষতিপূরণ তুলে নিতে পারে।

২০০৭ সাল পর্যন্ত এই চক্রাকার মুনাফাখোরি ভালোই চলছিল। কিন্তু সমস্যা বাধে অন্য জায়গায়। কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো এক পার্সেন্ট সুদে যে সাব-প্রাইম লোন

প্রদান করেছে, সেগুলো ছিল অ্যাডজাস্টেবল ইন্টারেস্ট রেটে। সোজা কথায় একটা নির্দিষ্ট সময় পর সুদের হার বেড়ে যাবে। দেখা গেল ২০০৭ সালে গিয়ে ১% সুদ ৫% হয়ে গেছে। সাব-প্রাইম লোন যারা নিয়েছে, এমনিতেই তাদের স্থায়ী আয় ছিল না। ব্যাংক তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যাচাই করা ছাড়াই লোন দিয়েছে। এখন সুদের হার ১% থেকে ৫% হয়ে যাওয়ায় তাদের অনেকেই ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়ে।

ব্যাংক তাদের বাড়ি সিজ করে সেগুলো নিলামে বিক্রি করতে শুরু করে। কিন্তু আগে থেকেই যথেষ্ট পরিমাণ মানুষ হাউজ লোন নিয়ে বাড়ি করে ফেলায় এবং নিলামের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রেতা পাওয়া মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল। ফলে বাড়ির দাম কমতে শুরু করে। ফলাফল হয়েছিল ভয়াবহ। বাড়ির দাম কমতে শুরু করায় দেখা গেল লোনগ্রহীতা যে বাড়িটি ক্রয় করেছে ৫০ লাখ টাকায়, এখন দাম কমে সেই বাড়ির মূল্য ৩০ লাখ। তো ব্যাংককে কেন ৩০ লাখ টাকার বাড়ির জন্য ৫০ লাখ টাকা পরিশোধ করবে?

ফলে অবশিষ্ট যারা ছিল তারাও হাউজ লোনের কিস্তি পরিশোধ বন্ধ করে দেয়। ইনভেস্টররা বিমা কোম্পানিকে গিয়ে ধরে। এক এআইজির ক্ষতির পরিমাণই ছিল মাত্র ৯৯ বিলিয়ন ডলার! মিলিয়ন না, বিলিয়ন। সরকার ৮৫ বিলিয়ন ডলার দিয়ে এআইজিকে রক্ষা করে। কিন্তু বড় বড় পাঁচটি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, অসংখ্য কমার্শিয়াল ব্যাংক ভয়াবহ সংকটে নিপতিত হয়। হাজার হাজার মানুষ চাকরি হারায়। এবং এই অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কা গোটা বিশ্বের প্রতিটি দেশকে প্রভাবিত করেছিল। বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষ চাকরি হারিয়েছে, শত শত কোম্পানি দেউলিয়া হয়েছে। আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, প্রায় ১৬৪ বছরের প্রাচীন লিম্যান ব্রাদার্সও (Lehman Brothers) দেউলিয়া হয়ে যায়!

এখানে লক্ষ করুন—ধাক্কা কোত্থেকে শুরু হয়েছে? সাব-প্রাইম লোনের সুদের হার বৃদ্ধি থেকে। বাস্তবে ৫% সুদ তেমন কিছুই না। বিশ্বের বহু দেশের স্বাভাবিক সুদহারই এর চেয়ে বেশি। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে এটুকুই গোটা সিস্টেম ধ্বংস করে দিতে সক্ষম।

এবার আমরা ২০০৭ সালে জাপানের রাজধানী টোকিওতে ফিরে যাই। আমেরিকাতে ততদিনে বাড়ির দাম কমতে শুরু করেছে। মার্কিন বিনিয়োগকারীরা তাদের ক্ষতি কমানোর জন্য অন্যান্য লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী ছিল। যেন এক খাতের লস অন্য খাতের লাভ দিয়ে ব্যালান্স করা যায়। কিন্তু তাদের হাতে নগদ টাকা নেই। মর্টজের ক্রেতা নেই। বাড়িও বিক্রি করা যাচ্ছে না। উপায় কী? জাপানের স্টক মার্কেটে তাদের প্রভূত বিনিয়োগ ছিল। নগদ টাকার জন্য

সেগুলো বিক্রি করে দিতে শুরু করে। যখন বিক্রির হিড়িক শুরু হয়, জাপানের স্টক মার্কেটেও ধস নামে।

সংকটের সূচনালগ্নে আমার জাপানি ক্লায়েন্টরা জিজ্ঞেস করেছিল কী করা উচিত? আমি বলেছিলাম যা পারো বিক্রি করে দাও। কারণ সংকটকালে দেখতে হয় আমি কতটুকু বিক্রি করতে সক্ষম, কতটুকু বিক্রি করতে ইচ্ছুক তা দেখার বিষয় নয়। ইচ্ছা না হলেও বিক্রি করে দিতে হবে।

এখানেও লক্ষ করুন বাহ্যত আমেরিকার হাউজিং সেক্টর এবং জাপানের স্টক মার্কেটে কোনো সম্পর্কই নেই। কিন্তু বিশেষ প্রেক্ষাপটে সম্পর্ক হয়ে যেতে পারে। আমার সাবেক সহকর্মী, নোবেল প্রাইজজয়ী Myron Scholes একে 'কন্ডিশনাল কোরিলেশন' নামে অভিহিত করে থাকে। যার সারমর্ম হচ্ছে দুটি মার্কেটের মধ্যে সম্পর্ক না থাকতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতির শিকার হয়ে সেখানে 'সম্পর্কের' জন্ম হতে পারে।

অনেকে Complex এবং Comlication শব্দদুটি ভজঘট পাকিয়ে ফেলেন। টেকনিক্যাল টার্ম যখন ব্যবহৃত হয়, তখন শব্দদুটির মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে। বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

কমপ্লেক্সিটি এবং নীতিনির্ধারণ

এখানে একটি সুসংবাদ এবং একটি দুঃসংবাদ আছে। সুসংবাদ হচ্ছে—পুঁজিবাজারের কমপ্লেক্সিটি রোধে অনেক কিছু করার সুযোগ আছে। দুঃসংবাদ হলো—নীতিনির্ধারকরা তেমন কিছুই করছে না। কমপ্লেক্স সিস্টেম একটা নির্দিষ্ট সাইজ বা স্কেলের পর ধসে পড়ে। হয়তো অতিরিক্ত এনার্জি ইনপুটের ফলে কিংবা মাত্রাতিরিক্ত মিথস্ক্রিয়ার কারণে। উভয় ক্ষেত্রেই সমাধান হচ্ছে টেকসই পরিমাণে পৌঁছে গেলে পতনের পূর্বেই সিস্টেমকে 'ডিস্কেল' করা।

আমেরিকার বনে দাবানলের আশঙ্কা দেখা দিলে ফরেস্ট রিজার্ভ সার্ভিস কী করে? তারা সুনিয়ন্ত্রিত আরও কিছু অগ্নিকাণ্ড তৈরি করে। অতিরিক্ত কাঠগুলো পুড়িয়ে ফেলে যেন বজ্রপাত বা ক্যাম্পফায়ার থেকে সেগুলোতে আর বড়সড় অগ্নিকাণ্ড না ঘটে। পুঁজিবাজারে স্কেলিং মেট্রিক্স আছে যদ্দ্বারা ডেরিভ্যাটিভসের পরিমাণ, ব্যাংকিং সিস্টেমে সম্পদ ঘনীভূত হওয়ার পরিমাণ এবং বৃহৎ ব্যাংকগুলোর সমুদয় সম্পত্তি পরিমাপ করা সম্ভব। যেভাবে ফরেস্ট রেঞ্জার্সরা সুনির্দিষ্ট মাত্রার পর ডিস্কেল করে, ব্যাংকিং সিস্টেমকেও নিয়মিত ডিস্কেল করতে হবে।

বড় বড় ব্যাংকগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে ভাগ করে ফেলতে হবে যেন তারা স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারে এবং তাদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন পায়,

এর বেশি না পায়। ফলে যদি কোনো কারণে এগুলো ভেঙে পড়ে, ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে তেমন প্রভাব ফেলবে না। মূল কথা হচ্ছে—এভাবে আমরা হয়তো ছোট ছোট পতন রোধ করতে পারব না, কিন্তু সামগ্রিক পতন রোধ করতে পারব। ছোট ছোট পতনগুলো ছোট ব্যাংকে সীমাবদ্ধ থাকবে। পাশাপাশি আমাদের অনেক ডেরিভেটিভস ব্যান করে দিতে হবে, গ্লাস-স্টিগাল আইন ফিরিয়ে আনতে হবে যেন ব্যাংকগুলোকে অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেন থেকে বিরত রাখা যায়।

এখানে বড় বড় ব্যাংকের লবিস্টরা হইহই করে তেড়ে এসে ব্যাংকগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে ভাগ করার বিরোধিতা করবে। যুক্তি দেখাবে বড় ব্যাংকের দক্ষতা বেশি থাকে, কাজের গড় খরচ কম হয়। যাকে তারা ফার্স্ট অর্ডার বেনিফিট বলে থাকে। এটা সত্য যে বড় ব্যাংকের কস্ট কম। কিন্তু পতনের পর যে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয় তার চেয়ে লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি ঢের ভালো। অর্থাৎ ফার্স্ট অর্ডার বেনিফিট সেকেন্ড অর্ডার কস্টের চেয়ে অনেক ভারী। দীর্ঘ মেয়াদে পতন রোধ করতে হলে ক্ষুদ্র মেয়াদে খরচবৃদ্ধি মেনে নিতেই হবে।

কিন্তু নীতিনির্ধারক এবং ব্যাংকগুলোর কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে না আদৌ তারা কমপ্লেক্স থিয়োরি বোঝে বা সিস্টেমিক পতনের সমূহ সম্ভাবনা তাদের ভাবাচ্ছে। ঋণ পরিশোধে যে পরিমাণ প্রবৃদ্ধি দরকার, আমেরিকা সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না। দেনার পরিমাণ দিনদিন বাড়ছে, ব্যাংকগুলো ওয়াশিংটনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, অর্থব্যবস্থা পতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। একমাত্র স্বর্ণই পারে টেকসই নিরাপত্তা দিতে।

ফিনান্সিয়ালাইজেশন অব দ্য ইকোনোমি

উৎপাদন, নির্মাণ, কৃষি ও অন্যান্য খাতে গতি আনতে ফিনান্সিং বা অর্থায়ন করা হয়। এসব সেক্টরকে লাভজনক করে তোলার উদ্দেশ্যে অর্থায়ন করা হয়। কিন্তু যখন ফিনান্সিয়াল লেনদেন থেকেই লাভ কামানোর ধান্দা শুরু হয়, এই প্রবণতাকে বলা হয় ফিনান্সিয়ালাইজেশন। সাব-প্রাইম হাউজলোনে আমরা দেখেছি কীভাবে শুধু 'লেনদেন' থেকেই মুনাফাখোরি হয়। ফিনান্সিং হচ্ছে মাধ্যম, এটি চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। কিন্তু বিগত ৩০ বছর ধরে ফিনান্সিয়ালাইজেশন বেড়েই চলছে।

২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকটের সময় ফিনান্স সেক্টর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির ১৭% ছিল। সুবিধাপ্রদানকারী সেক্টরের জন্য এটি অনেক বেশি। ব্যাংক কীভাবে জিডিপির ১৭ শতাংশ হয়? এটি সর্বোচ্চ পাঁচ শতাংশ হওয়ার কথা। ফিনান্সিয়ালাইজেশন এখন ক্যান্সারে পরিণত হয়েছে। ব্যাংকগুলোতে কমপ্লেক্স অর্থব্যবস্থা থেকে যত বেশি সম্ভব টাকা মেরে খাওয়ার সীমাহীন লোভ বাসা বেঁধেছে। সমস্যা আরও গুরুতর হয়েছে এই কারণে যে ব্যাংকগুলো টাকা মারার

যেসব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, সেগুলো সমাজে কোনোরূপ 'মূল্য' সংযোজন ছাড়াই টাকা শুষে নিচ্ছে। চরমমাত্রার ফিনান্সিয়ালাইজেশনের ফলেই ২০০৮ সালে বিশ্ব-অর্থব্যবস্থা পতনের দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিল।

এতসব কথার পর আমাদের মূল ফোকাস পয়েন্ট স্বর্ণে ফিরে যাই। যদি অর্থব্যবস্থা স্বর্ণভিত্তিক হয় তবে ফিনান্সিয়ালাইজেশনের নামে জুয়াচুরির সুযোগ থাকবে না। কারণ স্বর্ণ বানানো যায় না। সুনির্দিষ্ট মাত্রায় আবিষ্কৃত হয়। খনি আবিষ্কারের ফলে যে প্রবৃদ্ধি ঘটবে, তা সহনীয় মাত্রায় ঘটবে। তা ছাড়া বিগত ১০০ বছর ধরে বৃহৎ কোনো খনিও আবিষ্কৃত হয়নি। ১৮৪৫-১৮৯৮ পর্যন্ত বড় বড় কিছু খনি পাওয়া গিয়েছিল। তারপর থেকে প্রতিবছর ১.৬% বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সবচেয়ে মজার বিষয় কী জানেন? স্বর্ণের প্রবৃদ্ধির এই হার বিশ্বজনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ! মনে হচ্ছে স্বর্ণের এই অপ্রতুলতা স্বর্গ থেকে আসা। আপনার হাতে যদি 'সৎ টাকা' থাকে, তাহলে ফিনান্সিয়ালাইজিং করতে পারবেন না। কারণ উৎপাদন এবং উদ্ভাবন ছাড়া আপনার হাতে ফিনান্সিয়ালাইজিং করার মতো যথেষ্ট টাকা থাকবে না। ফিনান্সিং করার জন্য আপনার 'ছদ্ম টাকার' প্রয়োজন হবে অর্থাৎ নানা নামে কৃত্রিম টাকা তৈরি করতে হবে। কৃত্রিম স্বর্ণ তৈরির কোনো সুযোগ নেই।

কৃত্রিম টাকা তৈরির একটি উদাহরণ হচ্ছে—একজন ব্যাংকে গিয়ে ১০ টাকা জমা রাখল। আপনি গেলেন ১০ টাকা লোন নিতে, তারা আপনাকে ১০ টাকা লোন দেবে। ধরুন আপনি বাড়ি নির্মাণের জন্য লোন নিচ্ছেন, সে ক্ষেত্রে কিন্তু পুরো ১০ টাকা আপনার একসঙ্গে দরকার হবে না। বরং ব্যাংক আপনার নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে সেখান থেকে সময়ে সময়ে ১০ টাকা উত্তোলন করার সুযোগ দেবে। পরে আরেকজন এলো ১০ টাকা লোন নিতে। ব্যাংক কী করবে? তার নামেও একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দেবে, ১০ টাকার। এখন ব্যাংক ঋণ দিলো ২০ টাকা। কিন্তু ব্যাংকের হাতে আছে ১০ টাকা। অতিরিক্ত ১০ টাকা তারা কৃত্রিমভাবে তৈরি করেছে। সুদ কিন্তু দুজন থেকেই নেবে। অর্থাৎ পকেটে ১০ টাকা নিয়ে ব্যাংক দিব্বি ২০ টাকার মুনাফা খাচ্ছে।

সরকারপ্রদত্ত সুযোগসুবিধা এবং তথ্য-উপাত্ত ভোগ করে ফিনান্সিং-এর মহামারি ছড়িয়ে পড়ছে। পরবর্তী ধসের পূর্বেই এর লাগাম টেনে ধরতে হবে।

ফেডারেল রিজার্ভের ভূমিকা

ফেডারেল রিজার্ভকে ধরা হয় আমেরিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। প্রতিষ্ঠানটি বহু স্তরবিশিষ্ট জটিল এক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয়। সবার

ওপরের স্তরে আছে বোর্ড অব গভর্নরস। সাত সদস্যবিশিষ্ট এই বোর্ডের বেশ কিছু সিট সবসময়ই ফাঁকা থাকে। ফলে দেখা যায় তিনজন কিংবা চারজন কাজ চালাচ্ছে। পরবর্তী স্তরে আছে ১২টি আঞ্চলিক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক। দেশজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোতে এসব ব্যাংক অবস্থিত। যেমন ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক নিউইয়র্ক, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক বোস্টন, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ফিলাডেলফিয়া ইত্যাদি। মজার বিষয় হচ্ছে এসব আঞ্চলিক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকগুলো কিন্তু মার্কিন সরকারের মালিকানাধীন নয়! সরকারি প্রতিষ্ঠানও নয়। এগুলো সেসব অঞ্চলের ব্যাংকগুলোর মালিকাধীন। যেমন সিটি ব্যাংক এবং জেপিমর্গান ক্যাশ হচ্ছে নিউইয়র্কের ব্যাংক, ফলে নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের শেয়ারের মালিক তারা।

কেউ ফেডারেল রিজার্ভের ব্যক্তি-মালিকানা নিয়ে কথা বললে অনেকে এমনভাবে তাকায় যেন এটি কোনো গভীর, রহস্যাবৃত ষড়যন্ত্রতত্ত্ব। অথচ ১৯১৩ সালে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম তৈরির পর থেকেই এটি ব্যক্তি-মালিকানাধীন। এটি সর্বজনবিদিত, কোনো লুকোচুরি নেই। আঞ্চলিক ফেডারেল রিজার্ভগুলো ব্যক্তি-মালিকানাধীন। পুরো সিস্টেমের প্রাণকেন্দ্রে আছে বোর্ড অব গভর্নর, তারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত এবং সিনেট থেকে বিল পাশ করাতে হয়। ফলে সিস্টেমটি ব্যক্তি-মালিকানার সাথে সরকারি নিয়ন্ত্রণের এক উদ্ভট সংমিশ্রণ।

নীতিনির্ধারণে ফেডের ভূমিকা

ওপেন মার্কেট অপারেশনের মাধ্যমে ফেড দেশের সুদ রেট নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বরং বলা চলে ফেডের প্রধান মিশনগুলোর একটি হচ্ছে রেট নিয়ন্ত্রণ। কেনাবেচার কাজটা নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক করে থাকে। ফলে গোটা সিস্টেমের ওপর নিউইয়র্ক রিজার্ভের আলাদা গুরুত্ব আছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ফেড কীভাবে দীর্ঘমেয়াদি সুদহার নিয়ন্ত্রণ করবে? বিগত কয়েক বছর ধরে এই প্রশ্নটা খুব উত্থাপিত হচ্ছে।

প্রথমত তারা মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ট্রেজারি নোটগুলো কিনে নেয়। কিনে নেওয়ার এই প্রোগ্রামের নাম Quantitative easing, সংক্ষেপে কিউই। সাবেক ফেডারেল চেয়ারম্যান বেন বেরনাঙ্ক এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। তার যুক্তি হচ্ছে যদি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সুদহার কম হয়, তবে বিনিয়োগকারীরা ব্যাংকে টাকা না রেখে অন্য কোথাও ইনভেস্ট করবে। হয়তো স্টক মার্কেটে কিংবা রিয়েল এস্টেট সেক্টরে। ফলে সেগুলোর মূল্য বৃদ্ধি পাবে, সেখানে অধিকতর বিনিয়োগ হবে। ২০০৮ সাল থেকে ফেড এই পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। ভবিষ্যতে এটি ভয়াবহ ব্যর্থতা চিহ্নিত হবে, নিশ্চিত।

এ ছাড়া আরও উদ্যোগ নিয়ে থাকে, যেমন ফরোয়ার্ড গাইডেন্স বা স্বল্পমেয়াদি ঋণের সুদহার প্রকাশ। কিন্তু সেসবের সবগুলোই নির্ভর করে আপনি আদৌ ফেডকে কতটুকু বিশ্বাস করেন তার ওপর। তারা ২০০৭ থেকে এখনো পর্যন্ত বারবার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পলিসি চেঞ্জ করেই যাচ্ছে। স্বল্পমেয়াদি সুদহার বেশ কয়েকবার জিরোতে গিয়ে ঠেকেছে। তাদের এসব পরীক্ষানিরীক্ষা মোটেই সুসংহত কিছু না। যখন যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে সে অনুযায়ী পলিসি বানাচ্ছে। সাত বছরে যে প্রতিষ্ঠান ১৫ বার পলিসি চেঞ্জ করে তাদের ওপর বিনিয়োগকারীরা আস্থা রাখবে কেন?

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাহ্রাসের ইনস্যুরেন্স : স্বর্ণ

মুদ্রাস্ফীতি (ইনফ্ল্যাশন) ও মুদ্রাহ্রাসের (ডিফ্ল্যাশন) বিষয়টা আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি। আরেকটু ঝালিয়ে নিই, সাথে পারচেজিং পাওয়ার বা ক্রয়ক্ষমতাও বুঝে নিই। ইনফ্ল্যাশন ডিফ্ল্যাশনের সাথে পারচেজিং পাওয়ার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আপনার কাছ থেকে আমি এই বছর ১০০ টাকা ঋণ নিলাম, মনে করুন। আগামী বছর তা পরিশোধ করব, সাথে অতিরিক্ত ১০ টাকা দেবো। এই বছর এক কেজি চালের দাম ১০০ টাকা। আগামী বছর এক কেজি চালের মূল্য হয়ে গেল ১১০ টাকা। তো আমি আপনার থেকে ১০০ টাকা নিলাম, ১১০ টাকা ফেরত দিলাম, এতে কি আপনার ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে? বাড়েনি। কারণ এই বছর ১০০ টাকা দিয়ে যা কিনতে পারছেন, আগামী বছর ১১০ টাকা দিয়ে তা-ই কিনতে পারবেন, অতিরিক্ত ১০ টাকা দিয়ে কেনাকাটার ক্ষেত্রে আপনার কোনো লাভ হয়নি।

এর কারণ হচ্ছে ইনফ্ল্যাশন বা মুদ্রাস্ফীতি। অর্থাৎ টাকার মূল্য ১০% কমে গেছে। ফলে টাকা দিয়ে যেসব পণ্য কেনা হয় সেগুলোর মূল্য ১০% বেড়ে গেছে। পক্ষান্তরে যদি আগামী বছর এক কেজি চালের দাম হয় ৯০ টাকা। এর অর্থ হচ্ছে টাকার দাম বেড়েছে, টাকার বিপরীতে পণ্যের দাম কমেছে।

পারচেজিং পাওয়ারের ক্ষেত্রে ইনফ্ল্যাশন ও ডিফ্ল্যাশন কি প্রভাব ফেলে তা বোঝা গেল। এবার চলুন ইন্টারেস্ট রেট বা সুদহারের ওপর ইনফ্ল্যাশন-ডিফ্ল্যাশনের প্রভাব কেমন তা দেখি। এটা বেশ ইন্টারেস্টিং!

ধরুন, এই বছর আপনি কোনো ব্যাংক থেকে ১০০ টাকা ঋণ নিলেন ১০% সুদে। অর্থাৎ আগামী বছর ১১০ টাকা পরিশোধ করবেন। কিন্তু আগামী বছর ইনফ্ল্যাশন হল ৫%। তো আপনি যদিও ব্যাংকে পরিশোধ করবেন ১১০ টাকা। কিন্তু সে টাকায় ব্যাংক কত টাকার পণ্য কিনতে পারবে? ১০৫ টাকার। কারণ হচ্ছে ৫% ইনফ্ল্যাশন

হয়েছে, মানে পণ্যের দাম পাঁচ টাকা বেড়েছে। ফলে এই বছর যে পণ্যটা ১০০ টাকা, আগামী বছর তার দাম বেড়ে দাঁড়াবে ১০৫ টাকা। এখানে ব্যাংকের পাঁচ টাকা গচ্চা। আপনার থেকে যে ১০ টাকা নিয়েছে, সেখান থেকে পাঁচ টাকা তার লাভ। আর পাঁচ টাকা চলে গেছে ইনফ্ল্যাশনে। সোজা কথায়—সুদের হার ১০%, কিন্তু ব্যাংকের পারচেজিং পাওয়ার বাড়ছে ৫%।

পাঁচ টাকা কমে গেল কেন? ইনফ্ল্যাশন-সহ হিসাব করার কারণে। এই বিষয়টাকে নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট আর রিয়েল ইন্টারেস্ট রেট বলা হয়। নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে ১০ টাকা। যেখানে ইনফ্ল্যাশনের হিসাব নেই। কিন্তু রিয়েল ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে পাঁচ টাকা। এ ক্ষেত্রে নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট থেকে ইনফ্ল্যাশন বাদ দিতে হবে। খুব সহজ (১০-৫= ৫)।

কিন্তু যদি ডিফ্ল্যাশন হয়, তখন? ধরুন, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছেন ১০০ টাকা। আগামী বছর ডিফ্ল্যাশন হলো ৫%। অর্থাৎ টাকার মূল্য বেড়েছে, জিনিসপত্রের দাম কমেছে। ফলে এই বছর যে পণ্যের দাম ১০০ টাকা, আগামী বছর তা হবে ৯৫ টাকা। সাথে যদি আপনার ১০% সুদ যোগ করেন? এদিকে দাম কমার কারণে লাভ হচ্ছে পাঁচ টাকা, ওদিকে অতিরিক্ত ১০ টাকা। মোট ১৫ টাকা লাভ! অর্থাৎ ব্যাংকের সুদহার যদিও ১০%, কিন্তু তাদের পারচেজিং পাওয়ার বেড়েছে ১৫ পার্সেন্টেরও বেশি।

এবার আরেকটু গভীরে যাই। ধরুন, ব্যাংকের সাথে আপনার চুক্তি হলো যে, যদি ডিফ্ল্যাশন হয়, আপনি সুদের পরিমাণ থেকে ডিফ্ল্যাশন বাদ দিয়ে বাকিটুকু পরিশোধ করবেন। তো ৫% ডিফ্ল্যাশন হওয়ার ফলে আপনি ব্যাংককে ১১০ টাকা দেওয়ার পরিবর্তে ১০৫ টাকা দিলেন। ব্যাংকের কি পাঁচ টাকা লস? না। তার বরং ১০ টাকারও বেশি লাভ, পারচেজিং পাওয়ারের দিক থেকে। ওদিকে পণ্যের দাম পাঁচ টাকা কমেছে, এদিকে পাঁচ টাকা। এককথায়—ইনফ্ল্যাশন যত বেশি হবে, রিয়েল ইন্টারেস্ট রেট তত কমে আসবে। ইনফ্ল্যাশন যত কম, রিয়েল ইন্টারেস্ট রেট ততবেশি। ডিফ্ল্যাশন হলে আরও বেশি।

সাধারণত আমরা ভাবি যে, পণ্যের দাম কমলে (ডিফ্ল্যাশন) বুঝি ভালো। ওপরের উদাহরণ থেকে বলুন তো ডিফ্ল্যাশন ভালো কি না? না, ভালো নয়। কারণ আপনি যখন ১১০ টাকা পরিশোধ করলেন, বাহ্যত নমিনাল আপনি যদিও ১০ টাকা অতিরিক্ত দিয়েছেন, কিন্তু প্রকৃত বিচারে আপনি দিয়েছেন ১৫ টাকা। অর্থাৎ নমিনাল ইন্টারেস্ট ১০ টাকা হলেও রিয়েল ইন্টারেস্ট ১৫ টাকা। এজন্য সরকারগুলো কখনো ডিফ্ল্যাশন চায় না। কারণ এতে তাদের বৈদেশিক ঋণের 'রিয়েল ভ্যালু' বা প্রকৃত মূল্য বেড়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, ডিফ্ল্যাশন হলে শ্রমিকদের বেতন বাড়বে না। উলটো কমতে পারে, সে ক্ষেত্রে সরকারের ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ কমবে। ট্যাক্স কমলে সরকারের বিনিয়োগ কমবে, বিনিয়োগ কমলে কর্মসংস্থান তৈরির পরিমাণ কমবে, ফলে বেকারত্ব বাড়বে। এ ছাড়াও ডিফ্ল্যাশন অধিকতর ডিফ্ল্যাশন টেনে আনে। যদি বাড়ি, ফ্রিজ, বাইক, গাড়ির দাম কমে, আপনি প্রথমত হয়তো কিনতে আগ্রহী হবেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাববেন—দেখি আরও কমে কি না! আরেকটু অপেক্ষা করি। অন্যরাও অনুরূপ ভাবতে পারে। সে ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে চাহিদা কমে যাবে। চাহিদা কমার ফলে দাম আরও কমবে। কোম্পানিগুলো লস গুণতে হবে। হয়তো সেখানকার শ্রমিকরা চাকরি হারাবে, বেতন কমবে। ফলে দেখা যাচ্ছে সাদা দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ডিফ্ল্যাশন লাভবান মনে হলেও গোটা অর্থনীতির জন্য ডিফ্ল্যাশন সুনামিতুল্য। তাই সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সবচেয়ে ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন হচ্ছে— ডিফ্ল্যাশন।

স্বর্ণের ক্ষেত্রে ইনফ্ল্যাশন ও ডিফ্ল্যাশনের খুব ইন্টারেস্টিং ইফেক্ট আছে। তবে তা বুঝতে হলে ওপরে উল্লেখ-কৃত নমিনাল এবং রিয়েল ইন্টারেস্ট রেটের পার্থক্য বুঝতে হবে। স্বর্ণ সঞ্চয়কারীদের জন্য ২০১৪ এবং ২০১৫ সাল ছিল হতাশার বছর। গ্রিস, ইউক্রেন, সিরিয়া সংকট এবং চীনের স্টক মার্কেট ধসের পরও স্বর্ণের দাম কমেছে। সাধারণত সংকটকালে স্বর্ণের দাম বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে সংকটকালের 'স্বর্গ' স্বর্ণের দাম তাহলে কেন বাড়েনি?

কিন্তু প্রশ্নটা হবে ঠিক উলটো—স্বর্ণের দাম কেন আরও কমেনি? যেখানে ২০১৪ সালের জুন থেকে ২০১৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তেলের দাম কমেছে ৭০%! সে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের তুলনায় স্বর্ণের দাম কমেনি বললেই চলে।

যদি ডিফ্ল্যাশন নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তবে স্বর্ণের দাম বাহ্যত কমতে পারে। সেটা হবে নমিনাল প্রাইসের পতন। উদাহরণত—বছরের শুরুতে যদি স্বর্ণের দাম থাকে ১২০০ টাকা প্রতিআউন্স, বছর শেষে সেটা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১১৮০ টাকা, এবং সে বছর ডিফ্ল্যাশন হয় ৫%। এ ক্ষেত্রে স্বর্ণের নমিনাল প্রাইস ১.৭% কমেছে, ১২০০ থেকে ১১৮০ তে নেমে এসেছে। কিন্তু স্বর্ণের রিয়েল প্রাইস তো কমেইনি; বরং ৩.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে! কারণ বছর শেষে স্বর্ণ বিক্রি করে যে ১১৮০ টাকা পাবে, তা বছরের প্রথমাংশের তুলনায় ১২৪০ টাকার সমান। ডিফ্ল্যাশনের কারণে টাকার পারচেজিং পাওয়ার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাহ্যত যদিও ২০ টাকা কমে গেছে, কিন্তু সেই ২০ টাকা কমেই আপনি আরও অতিরিক্ত ৪০ টাকার পণ্য কিনতে পারবেন।

যদি ডিফ্ল্যাশনের ফলে স্বর্ণের দাম কমে, তবে অন্যান্য পণ্যের দাম আরও বেশি কমবে। ২০১৪ তে আমরা যা দেখলাম—স্বর্ণের দামে সামান্য তারতম্য হয়েছে, অথচ অন্যান্য পণ্যের দাম কমেছে ৭০%-এরও বেশি। তাই ডিফ্ল্যাশন হলে বাহ্যত স্বর্ণের

নমিনাল প্রাইস কমে যায়, কিন্তু রিয়েল প্রাইস সংরক্ষণের জন্য স্বর্ণের বিকল্প নেই। ঐতিহাসিকভাবে স্বর্ণ ইনফ্ল্যাশন এবং ডিফ্ল্যাশন উভয় ক্ষেত্রে 'মূল্য' সংরক্ষণ করে। তা ছাড়া ডিফ্ল্যাশন হলে চিন্তিত হবার কিছু নেই, কারণ সেন্ট্রাল ব্যাংকের জন্য সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন হচ্ছে ডিফ্ল্যাশন। যদি কখনো ডিফ্ল্যাশন ঘটে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকার ইনফ্ল্যাশন ঘটানোর জন্য তাদের সাধ্যের সবকিছু করবে। যদি কোনো উপায়ই কাজ না করে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীসের আশ্রয় নেবে জানেন? স্বর্ণের। স্বর্ণের দাম বৃদ্ধি করে দেবে, ফলে অন্যান্য পণ্যের দামও স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে যাবে। কারণ স্বর্ণের মূল্যবৃদ্ধি মানে টাকার মূল্যহ্রাস—ইনফ্ল্যাশন।

১৯৩৩ সালে আমেরিকা ঠিক এটিই করেছিল। সরকার প্রতিআউন্স স্বর্ণের দাম ২০.৬৭ ডলার থেকে বাড়িয়ে ৩৫ ডলার করে দেয়। এমন নয় যে বাজারের চাহিদার কারণে স্বর্ণের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। বরং তখন ডিফ্ল্যাশন চলছিল। সরকার ইনফ্ল্যাশন ঘটানোর জন্য ইচ্ছা করে স্বর্ণের দাম বাড়িয়েছে। এবং এই দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যও এই ছিল না যে স্বর্ণের দাম বৃদ্ধি পাক, সরকারের বরং উদ্দেশ্য ছিল বাকি সব পণ্যের দাম বাড়ুক—তুলা, তেল, স্টিল, গম এবং অন্যান্য পণ্য।

বর্তমানে যদি চরম ডিফ্ল্যাশন দেখা দেয়, সরকার হয়তো প্রতিআউন্স স্বর্ণের দাম বাড়িয়ে ৩ হাজার থেকে ৪ হাজার ডলার করতে পারে বা আরও বেশি। স্বর্ণের বিনিয়োগকারীদের মুনাফাবৃদ্ধির জন্য নয়, ডিফ্ল্যাশন থেকে হাইপার ইনফ্ল্যাশন ঘটানোর জন্য। যদিও এতে চূড়ান্ত লাভবান হবে যাদের হাতে স্বর্ণ মজুত আছে।

কারেন্সি ওয়ারেও স্বর্ণের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ স্বর্ণ কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন করা যায় না, এবং স্বর্ণ প্রতি-আক্রমণ (ফাইট ব্যাক) করতে সক্ষম না। যদি মার্কিন সরকার স্বর্ণের বিপরীতে ডলারের দাম কমিয়ে দেয়, স্বর্ণের দাম বাড়িয়ে দেয়, বিষয়টা এখানেই শেষ, স্বর্ণ নিজ থেকে আবার নিজের দাম কমাতে পারবে না। কিন্তু মার্কিন সরকার যদি ইউরোর তুলনায় ডলারের দাম কমিয়ে দেয়, ইউরোজোন হয়তো পালটা ইউরোর দাম কমিয়ে দেবে। পুনরায় লড়াইয়ে নামবে। এভাবে কারেন্সি ওয়ার চলতেই থাকবে, যেমন ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে। উল্লেখ্য, ইনফ্ল্যাশন হলে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়, তাই সরকারগুলো সহনীয় মাত্রায় সবসময় ইনফ্ল্যাশন জারি রাখে। রপ্তানি বৃদ্ধির জন্যও কখনো কখনো টাকার (কারেন্সির) মান কমিয়ে দেয়।

শেষকথা হচ্ছে—ইনফ্ল্যাশন বা ডিফ্ল্যাশন, উভয় ক্ষেত্রে স্বর্ণের দাম বৃদ্ধি পায়। ইনফ্ল্যাশন হলে আপনা থেকেই বাড়ে, ১৯৭০-এর দশকে আমরা তা দেখেছি। ডিফ্ল্যাশন হলে সরকার জোর করে বাড়িয়ে দেয়, যেমন ঘটেছিল ১৯৩০ এর দশকে। তাই সব বিনিয়োগকারীর উচিত নিজ ভান্ডারে স্বর্ণের মজুত গড়ে তোলা, পরিমাণ বৃদ্ধি করা—গোল্ড ইজ দ্য বেস্ট ইনস্যুরেন্স।

সপ্তম অধ্যায়

স্বর্ণ পরিবর্তনহীন

স্বর্ণের দাম

মানুষ যখন বলে—স্বর্ণের দাম বাড়ছে, স্বর্ণের দাম কমছে, তারা একপেশে রেফারেন্সে কথা বলে। মূলত স্বর্ণ হচ্ছে ইকোনোমিস্টদের ভাষায়, 'কাউন্টিং ডিভাইস', যা দিয়ে অন্য সবকিছু পরিমাপ করা হয়। ফলে স্বর্ণের দাম বাড়ে না, কমে না। ডলারের দাম বাড়ে কমে। যদি স্বর্ণের দাম ১২০০ ডলার থেকে বেড়ে ১৩০০ ডলার হয়, এর অর্থ এই নয় যে স্বর্ণের দাম বেড়েছে; বরং স্বর্ণের বিপরীতে ডলারের দাম কমেছে। অর্থাৎ পূর্বে আমি এক আউন্স স্বর্ণ কেনার জন্য ১২০০ ডলার ব্যয় করতে হতো, এখন ডলারের দাম কমে গেছে, তাই আরও ১০০ ডলার বেশি দিয়ে এক আউন্স স্বর্ণ কিনতে হচ্ছে।

যদি আপনার মনে হয় বিশ্বব্যাপী ডলারের অবস্থান দিনদিন সুসংহত হচ্ছে, তবে আপনার উচিত ডলার সংগ্রহ করা। কিন্তু যদি মনে করেন ডলারের অবস্থান দিনদিন দুর্বলতর হচ্ছে, তবে উচিত হচ্ছে আপনার সংগ্রহতালিকায় স্বর্ণ সংযুক্ত করা। আমেরিকা-ভিন্ন অন্যান্য দেশে বসবাসকারীদের জন্য এটি অধিকতর প্রযোজ্য। কারণ স্বর্ণের মোকাবিলায় যদি ডলারের দাম কমে যায়, তবে অন্যান্য কারেন্সি যেমন টাকার দাম আরও বেশি কমবে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণ সংগ্রহ যতটা লাভজনক, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তারচেয়ে বেশি লাভজনক।

তবে স্বর্ণের বৈশ্বিক গতিপ্রকৃতি বুঝতে হলে আপনি স্বর্ণের দাম শুধু ডলারে হিসাব করলে চলবে না, আপনাকে ক্রস কারেন্সি রেটও মাথায় রাখতে হবে—অর্থাৎ মুদ্রাগুলোর পারস্পরিক বিনিময় হার কোন দিকে। কয়েক বছর পূর্বে ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপির দাম পড়ছিল, সাথে স্বর্ণের বিক্রিও কমছিল। এর কারণ এই নয় যে ভারতীয়রা স্বর্ণের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। বরং যখন ডলারের বিপরীতে রুপির দাম কমতে থাকবে, তখন যদি আপনি স্বর্ণ কিনতে যান তবে অবশ্যই আগের চেয়ে বেশি রুপি পরিশোধ করতে হবে। এই কারণে স্বর্ণবিক্রি কমে গিয়েছিল। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। আপনি যদি আপনার দেশের কারেন্সিতে স্বর্ণ কেনাবেচা করতে চান, সে ক্ষেত্রে আপনাকে স্বর্ণ বনাম ডলারের মূল্য দেখলেই হবে না, আপনার বেজ কারেন্সির হিসাবনিকাশও মাথায় রাখতে হবে।

তাই বিনিয়োগকারীদের প্রতি আমার পরামর্শ হলো, স্বর্ণের পরিমাপ করবেন ওজনে, ডলারে নয়। ডলারে স্বর্ণের দাম কেমন, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনার নিকট কতটুকু বাস্তব স্বর্ণ আছে। চার্টে দেখবেন প্রতিদিন স্বর্ণের দাম উঠানামা করছে যা খুবই অস্থিতিশীল। ফলে আপনার তরল সম্পদের ১০ শতাংশ স্বর্ণ রাখুন। স্বর্ণ যদিও আপনার পোর্টফোলিওর অত্যন্ত মূল্যবান অংশ, কিন্তু বহুমাত্রিকতা রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কাগুজে স্বর্ণের দর বনাম বাস্তব স্বর্ণের দর

স্বর্ণের গল্পে আরেকটি টুইস্ট হচ্ছে, সাধারণত বিশ্বাস করা হয়—বাজার নিয়ন্ত্রিত হয় 'ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই' নীতির মাধ্যমে। অর্থাৎ কোনো বস্তুর সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে দাম কমে এবং চাহিদা বাড়ে। সরবরাহ কমে গেলে দাম বাড়ে। প্রতিনিয়ত আমরা এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই যাচ্ছি। কিন্তু বাস্তব স্বর্ণের আন্তর্জাতিক বাজার লক্ষ করলে দেখতে পাবেন হঠাৎ ডিমান্ড বেড়ে যাচ্ছে, দাম হুহু করে বাড়ছে। কিন্তু স্বর্ণের সাপ্লাই বা জোগান একটুও বৃদ্ধি পায়নি। এই বৈপরীত্য কেন?

এই পাজল সলভ করার জন্য আপনাকে স্বর্ণের বাজার দেখতে হবে। স্বর্ণের দুই ধরনের বাজার প্রচলিত—একটি কাগুজে বাজার, যেখানে হরদম স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে আপনি এক টুকরো কাগজ ছাড়া আর কিছুরই মালিকানা পাবেন না। আরেকটি হচ্ছে বাস্তব বাজার। স্বর্ণের কাগুজে বাজার বাস্তব স্বর্ণের পরিমাণের চেয়ে শতগুণ বড়ও হতে পারে। মূলত 'কাগজ' সাপ্লাই বেড়ে গেল দাম কমবে, 'কাগজ' কমে গেলে দাম বাড়তে পারে, অথচ বাস্তব স্বর্ণের পরিমাণে বিন্দুমাত্র হেরফের হয়নি।

স্বর্ণের ক্রেতাদের মধ্যে ১০০ জন ভাববে সে স্বর্ণের মালিক। কিন্তু তাদের ৯৯ জন ভুল। সংকট তৈরি হলে মাত্র একজন বাস্তব স্বর্ণ পেতে পারে, বাকিদের ভাগে কাগজ ছাড়া কিছুই জুটবে না। স্বর্ণের কাগুজে বাজার ততদিন খুব ভালো পারফর্ম করবে যতদিন সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে—ক্রেতারা বাস্তব স্বর্ণ না চাইবে, কাগুজে চুক্তিপত্রেই সন্তুষ্ট থাকবে। কিন্তু এই বাজার এক রাতেই ধসে পড়তে পারে। দিনদিন এই চিত্র পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন ক্রেতারা অধিকহারে বাস্তব স্বর্ণের চাহিদা পেশ করতে শুরু করছে। নানা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোও ব্যাংক অব ইংল্যান্ড এবং ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কের কোষাগার থেকে স্বর্ণের 'বাস্তব' ডেলিভারি চাচ্ছে।

আমরা দেখেছি ভেনিজুয়েলা তাদের স্বর্ণ কারাকাসে নিয়ে গেছে, জার্মানি নিয়ে গেছে ফ্রাঙ্কফুর্টে। এমনকি আজারবাইজানের মতো ছোট খেলোয়াড়ও বাকুতে স্বর্ণ

নিয়ে গেছে। কাগুজে বাজার চলে নিউইয়র্ক, লন্ডন এবং লন্ডন বুলিয়ন মার্কেট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ভায়াগুলোর যোগসাজশে।

পক্ষান্তরে বাস্তব মার্কেটে দিনদিন লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি আপনি স্বর্ণের বৃহৎ ক্রেতা হয়ে থাকেন, তবে লক্ষ করে থাকবেন যে রিফাইনারি ছাড়া অন্য কোথাও থেকে কিনতে পারছেন না, স্বর্ণ পাচ্ছেন না। এর অর্থ হচ্ছে বাস্তব স্বর্ণের সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রেতা নেই। এমনকি রিফাইনারি থেকে কিনতে গেলেও আপনাকে পাঁচ থেকে ছয় সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। এ থেকেই বোঝা যায় বাস্তব স্বর্ণের বাজার কতটা প্রতিযোগিতাপূর্ণ।

চীন, রাশিয়া, ইরান এবং অন্যান্য দেশের সেন্ট্রাল ব্যাংকগুলো যথাসম্ভব স্বর্ণ মজুত করছে। চীনের ক্রয়প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয়। ২০০৯ সালের পর ২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো চীন তাদের অফিশিয়াল স্বর্ণের মজুত আপডেট করেছে, ১০৫৪ টন থেকে বেড়ে তখন পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৫৮ টন। বর্তমানে আইএমএফের রিপোর্টিং ক্রাইটেরিয়া পূরণার্থে প্রতিমাসে চীনের তথ্য আপডেট করতে হচ্ছে। কিন্তু তথ্যের ক্ষেত্রে চীন লুকোচুরি খেলছে। পূর্বে যেমন বলেছি—তাদের হাতে সম্ভাব্য স্বর্ণের পরিমাণ ৩ হাজার টন, যা পিপলস লিবারেশন আর্মির সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকে।

সেই তুলনায় রাশিয়ার স্বর্ণ মজুত অধিকতর স্বচ্ছ। তারা নিয়মিত তথ্য আপডেট করছে। এবং তাদের হাতে গোপন স্বর্ণ থাকার কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। রাশিয়া বেশিরভাগ স্বর্ণ তাদের অভ্যন্তরীণ খনি থেকে সংগ্রহ করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে যেতে হয় না। কিন্তু চীনের স্বর্ণসংগ্রহ অভিযান এতই তীব্র যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় খনিও তাদের চাহিদা মেটাতে অক্ষম। ফলে তাকে আন্তর্জাতিক বাজারের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। চোরাচালান করতে হচ্ছে এবং সেনাবাহিনী দিয়ে স্বর্ণ লেনদেন করতে হচ্ছে, যেন উন্মুক্ত বাজারে দামের ওপর প্রভাব না পড়ে।

রাশিয়া, চীন, ইরান, জর্দান, তুরস্ক-সহ অনেক দেশ আন্তর্জাতিক বাজার থেকে স্বর্ণক্রয় অভিযান তীব্রতর করছে। এটি চলমান থাকলে বিশ্ববাজারে স্বর্ণের ঘাটতি তৈরি হতে পারে, তবে তা আগামীকালই ঘটতে যাচ্ছে না। এবং আমার বিশ্বাস বাস্তব স্বর্ণের চাহিদা এভাবে চলমান থাকলে ভুয়া কাগুজে স্বর্ণের পিরামিড ভেঙে পড়তে পারে। এবং কোনো সন্দেহ নেই যে এই সময়ে কাগুজে স্বর্ণের জোগানের মাধ্যমে বাস্তব স্বর্ণের বাজারদর চাপিয়ে রাখার চেষ্টা করা হবে।

২০১৩ সালে আমি সুইজারল্যান্ডে পৃথিবীর বৃহত্তম একটি গোল্ড রিফাইনারির সিনিয়র এক্সিকিউটিভের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তার রিফাইনারি প্রতিদিন তিন শিফটে পুরো ২৪ ঘণ্টা কাজ করে। এই বিপুল কর্মযজ্ঞের পর সে যে পরিমাণ স্বর্ণ

উৎপাদন করে তার পুরোটাই বিক্রি করে দেয়। প্রতিসপ্তাহে ২০ টন! এর ১০ টনই যায় চীনে! অর্থাৎ মাত্র একটি রিফাইনারি থেকেই চীনে প্রতিবছর স্বর্ণ যাচ্ছে ৫০০ টন! চীনের চাহিদা আরও বেশি। কিন্তু রোলেক্সের মতো পুরাতন কাস্টমারদের দিতে গিয়ে সে চীনের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। পাশাপাশি তার বছরের সব স্বর্ণ অগ্রিম বিক্রি হয়ে যায়। সারা বছরে যা সংগ্রহ করতে সে হিমশিম খায়।

রিফাইনারিগুলো বহু উৎস থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করে থাকে। কখনো পুরোনো ৪ হাজার আউন্স ওজনের বার গলিয়ে ৯৯.৯০% পিউর স্বর্ণকে রিফাইন করে ৯৯.৯৯ পিউর এক কেজির স্বর্ণের বারে পরিণত করে। তারপর সেগুলো চীনে চালান করা হয়।

সুইজারল্যান্ডে আমি ভল্ট অপারেটরের সাথেও কথা বলেছি। স্বর্ণের নিরাপদ সংরক্ষণই যাদের দায়িত্ব, সে আমাকে বলেছে চাহিদা অনুপাতে তারা ভল্ট তৈরি করতে পারছে না। গতির সাথে পাল্লা দিয়ে কুলানো যাচ্ছে না। বর্তমানে সুইস আর্মির সাথে তাদের আলোচনা চলছে। আল্পস পর্বতমালায় আর্মির দখলে থাকা ফাঁপা পাহাড়গুলো তাদের নিকট ছেড়ে দিতে। এগুলোতে বৃহৎ বৃহৎ টানেল আছে, আগে সেখানে গোলাবারুদ স্টোর করা হতো। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুইস আর্মি কিছু কিছু টানেল ভল্ট অপারেটরদের দিয়ে দিচ্ছে।

ইউবিএস, ক্রেডিট সুইস-সহ অন্যান্য ব্যাংক থেকে প্রাইভেট ভল্টে স্বর্ণ স্থানান্তরের কাজটা নিরাপদ লজিস্টিক ফার্মগুলোর মাধ্যমে করানো হচ্ছে। তারা এসব স্বর্ণ ব্রিঙ্কস, লুমিস ও অন্যান্য ভল্ট অপারেটরদের স্টোরেজে নিয়ে যাচ্ছে। বাস্তব স্বর্ণের ডেলিভারি বিলম্বিত হচ্ছে কারণ রিফাইনারি এবং ভল্টগুলো এত এত স্বর্ণ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে যদি স্বর্ণের চাহিদা এতই তীব্র হয়, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দরপতন হচ্ছে কেন? দাম তো বাড়ার কথা। উত্তর হচ্ছে অবিক্রিত কাগুজে স্বর্ণ, আন-অ্যালোকেটেড স্বর্ণের বিক্রিতে ধস দাম কমিয়ে রাখতে সহায়তা করছে। যার সহজ অর্থ হলো, একদিকে বাস্তব স্বর্ণের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে কাগুজে স্বর্ণের বিক্রি কমে যাচ্ছে।

তীব্র রশি টানাটানি চলছে। রশির এক প্রান্তে আছে সেন্ট্রাল ব্যাংকস, বুলিয়ন ব্যাংকস এবং অন্যান্য কাগুজে ব্যবসায়ীরা। অপর প্রান্তে আছে বাস্তব স্বর্ণসন্ধানী এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীর দল। আজ হোক বা কাল, একদল হাল ছেড়ে দেবে, কিংবা রশিই ছিঁড়ে যাবে। বাস্তব স্বর্ণ সাপ্লাইয়ে কোনো ধরনের ব্যাঘাত স্বর্ণ ক্রয়ের প্যানিক তৈরি করতে পারে, যার ফলে দাম হবে আকাশচুম্বী। ডেলিভারিতে ব্যাঘাত কিংবা বড়সড় কোনো অর্থায়নকারীর মৃত্যু থেকেও এই অবস্থার সূচনা হতে পারে।

স্বর্ণের মূল্যবৃদ্ধি

২০১৪ সালে আমি অস্ট্রেলিয়া ট্যুরে গিয়ে সে দেশের শীর্ষস্থানীয় এক স্বর্ণের বার বিক্রেতার সাথে দেখা করি। তাদের প্রতিষ্ঠানের সিইওর ভাষ্যমতে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় যখন স্বর্ণের দাম কমতে থাকে। ডলারের বিপরীতে স্বর্ণের দাম কমতে শুরু করলে আমাদের অফিসের বাইরে লাইন লেগে যায়।

আমি আমার ক্লায়েন্টদের পরামর্শ দিয়ে থাকি তাদের বিনিয়োগযোগ্য অর্থের ১০ ভাগ স্বর্ণে বিনিয়োগ করতে এবং সেটা হবে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ। অনাকাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক সংকটে যা তাদের ভরসাস্থল হবে। স্বর্ণ কিনে স্টোর করে রাখবে। যারা এই পরামর্শ মেনে চলেন, তারা স্বর্ণের দৈনন্দিন দামের উঠানামায় প্রভাবিত হওয়ার কথা না। একটু দাম কমলেই লাইনে দাঁড়ানোর কথা না। আবার দাম বেড়ে গেলে বিক্রি করে শর্টকাট মুনাফার পেছনে ছুটবে না।

২০১১ তে সর্বোচ্চ দাম থাকার পর সহসাই স্বর্ণের দরপতনের ব্যাখ্যা হচ্ছে ২০১২ সালের শুরুতে ফেডারেল রিজার্ভের পলিসির কারণে ডলার শক্তিশালী হতে শুরু করে। এসব পলিসির মধ্যে ছিল ২০১৩ সালের ট্যাপার টক। এ সময় ইউরোর মূল্য ১.৪০ ডলার থেকে কমে ১.০৫ ডলার হয়ে যায়। জাপানিজ ইয়েনের দামও ডলারপ্রতি ৯০ ইয়েন থেকে ১২০ ইয়েন হয়ে যায়। প্রায় ৫০টি সেন্ট্রাল ব্যাংক এ সময় ডলারের বিপরীতে তাদের মুদ্রার দাম কমিয়ে দেওয়ার জন্য সুদহার হ্রাস করে। ২০১৪ থেকে ২০১৫ নাগাদ তেল, চিনি, কফি থেকে শুরু করে অসংখ্য পণ্যের দাম কমে যায়। এককথায় ডিফ্ল্যাশনের তোড়জোড় চলছিল।

তো, যখন ডলার শক্তিশালী হচ্ছে তখন কি আপনি আশা করেন যে ডলারের বিপরীতে স্বর্ণের দাম কমবে? বিনিয়োগকারীদের বরং প্রশ্ন করা উচিত ছিল—এটি কি স্থায়ী হবে? নতুন বিশ্বব্যবস্থার উন্মেষ ঘটছে? সম্ভাব্য উত্তর হচ্ছে—না। যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্য কারেন্সির দরপতন অনুমোদন করেছে কারণ তখন সেসব দেশের সহায়তা প্রয়োজন ছিল। জাপানের অর্থনীতি ইনফ্ল্যাশন আনতে মরিয়া ছিল। ২০০৭ সালে শুরু হওয়া মন্দায় ইউরোপের অর্থনীতি তখন দ্বিতীয়বারের মতো ধাক্কা খেয়েছে। এজন্য আমেরিকা ইউরো আর ইয়েনের মূল্যহ্রাসে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু এটি ছিল ফেডের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। কারণ তখন আমেরিকা নিজেই কাতরাচ্ছিল, শক্তিশালী ডলারের দায় বহন করার মতো সামর্থ্য তার ছিল না। ২০১৩ সালে অর্থনৈতিক ভঙ্গুর দশার মধ্যে ডলারকে শক্তিশালী করার ফলে ২০১৪ সালের শেষ প্রান্তিকেই যুক্তরাষ্ট্র ডিজ—ইনফ্ল্যাশনের মুখে পড়ে।

যখন দেশে ডিফ্ল্যাশন চলছে, সুদহার শূন্যে নেমে এসেছে, ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার প্রিন্ট করতে হচ্ছে, সম্ভাব্য সব উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে, তখন ইনফ্ল্যাশন সৃষ্টি

করার একমাত্র পথ হচ্ছে মুদ্রার মান হ্রাস করা। তা না করে ফেড উলটো পথে হেঁটেছে।

ম্যানিপুলেশন

যখনই দেখবেন স্বর্ণের মূল্য কমেছে, বুঝে নেবেন স্বর্ণের বাজারে কোথাও না কোথাও ম্যানিপুলেশন হচ্ছে। এর পক্ষে পরিসংখ্যাগত, ঐতিহাসিক এবং ফরেনসিক প্রমাণাদি রয়েছে। ১৯৬০ সালের 'লন্ডন গোল্ড পুলে'র ঘটনা, কিংবা সত্তরের দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও আইএমএফের স্বর্ণ ডাম্পিংয়ের ঘটনা স্মরণ করতে পারেন। এমনকি ২০১০ সালেও আইএমএফ মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ৪ হাজার টন স্বর্ণ বিক্রি করেছে। অ্যাকাডেমিক বহু গবেষণায়ও স্বর্ণ ম্যানিপুলেশনের প্রমাণ মিলেছে।

যখন স্বর্ণের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়, সেন্ট্রাল ব্যাংকের কাজ হচ্ছে তা সহনীয় মাত্রায় ধরে রাখা। তখন চাইলে সেন্ট্রাল ব্যাংক ম্যানিপুলেট করতে পারে। ২০১১ সালের আগস্টে যখন স্বর্ণের দাম আউন্সপ্রতি ২ হাজার ডলার ছুঁইছুঁই করছে, এবং আরও বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তখন আসলেই দাম কমানোর প্রয়োজন ছিল। ফলে সেন্ট্রাল ব্যাংক গোল্ড ম্যানিপুলেট করেছে। ম্যানিপুলেশনের জন্য যেসব টেকনিক ব্যবহার করা হয় সেগুলো নিম্নরূপ।

স্বর্ণ ডাম্পিং

স্বর্ণের মূল্য অত্যধিক বেড়ে গেলে তা কমানোর সবচেয়ে শর্টকাট এবং নিশ্চিত পথ হচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যাংকের হাতে থাকা স্বর্ণ ডাম্পিং—খোলা বাজারে বিক্রি করে দেওয়া। কম দামে বিক্রি করতে শুরু করে। এ ছাড়াও উন্মুক্ত বাজারে স্বর্ণের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দাম কমে আসে। বহু দশক ধরে এটা চলমান। শুরুটা হয়েছিল ১৯৬০ সালে। সে সময় স্বর্ণের দাম কমানোর জন্য পশ্চিম জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য-সহ ব্রেটন উডস সিস্টেমের সদস্যরা লন্ডন বুলিয়ন মার্কেটে স্বর্ণ বিক্রি করে দিচ্ছিল। এই ঘটনা লন্ডন গোল্ড পুল নামে পরিচিত।

সত্তরের দশকেও গোল্ড ডাম্পিং ঘটেছে। দশকের সূচনালগ্নে আউন্সপ্রতি স্বর্ণের দাম ছিল ৩৫ ডলার। ১৯৭১ সালে নিক্সন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বাতিল করে দেওয়ার পর তা ৪২ ডলার হয়ে যায়। ১৯৮০ সালের জানুয়ারি নাগাদ আউন্সপ্রতি স্বর্ণের দাম গিয়ে ৮০০ ডলারে ঠেকে! ৩৫ ডলার থেকে ১০ বছরের ব্যবধানে ৮০০ ডলার! যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণের দাম কমাতে মরিয়া ছিল। ফেডারেল রিজার্ভ গোপনে ১ হাজার টন স্বর্ণ বাজারে বিক্রি করে দেয়। এবং আইএমএফকেও স্বর্ণ বিক্রি করতে

চাপ দেয়। আইএমএফ বিক্রি করে ৭০০ টন। আমেরিকা—আইএমএফ মিলে সে সময় মোট ১৭০০ টন স্বর্ণ বিক্রি করে। এটি মোট অফিশিয়াল স্বর্ণের পাঁচ শতাংশ। এতেও লাভের লাভ কিছুই হয়নি। দাম কমানো যায়নি। অবেশেষে যুক্তরাষ্ট্র হাল ছেড়ে দেয়। যতখুশি দাম বাড়ুক। সে সময়ের ফেড চেয়ারম্যান আর্থার বার্নস, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড, পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর—সবার থেকে আমি ম্যানিপুলেশনের ক্লাসিফাইড প্রমাণ পেয়েছি। ১৯৯৯ সালে ব্রিটিশ চ্যান্সেলর অব এক্সচেকার ব্রিটেনের মোট স্বর্ণের তিন ভাগের দুই ভাগই ডাম্পিং করে ফেলেছিল! তাও বিগত ৩৫ বছরের সর্বনিম্ন দামে! ২০০০ সালের পর সুইজারল্যান্ডও স্বর্ণ ডাম্পিং করেছে।

ফলে দেখা যাচ্ছে বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তিগুলো বাস্তব স্বর্ণ ডাম্পিং করে থাকে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এর ফলে সেন্ট্রাল ব্যাংক স্বর্ণহীন হয়ে যেতে পারে। যেমন ব্রিটেনের হাতে এখন তেমন স্বর্ণ নেই। সুইজারল্যান্ড যদিও বেশ বড় একটা অংশ ধরে রেখেছে, কিন্তু সাধারণত যে পরিমাণ রাখত, তারচেয়ে অনেক কম। আমেরিকা আর কোনো স্বর্ণ ডাম্পিং না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যান্য দেশও ডাম্পিং বন্ধ করে দিচ্ছে কারণ এই ম্যানিপুলেশন পলিসি কাজ করছে না। যে পরিমাণ স্বর্ণ ডাম্পিং করতে চায়, তার নগদ ক্রেতা মিলে যায়। খোলাবাজারে স্বর্ণ যাওয়ার সুযোগই হয় না।

পেপার ম্যানিপুলেশন

বাস্তব স্বর্ণ ম্যানিপুলেশন কার্যকারিতা হারানোর ফলে এখন সরকারগুলো কাগুজে স্বর্ণের ম্যানিপুলেশনের দিকে ঝুঁকছে। এজন্য যা করতে হবে—কাগুজে বাজার ক্লোজ হওয়ার একদম পূর্বমুহূর্তে বিপুল পরিমাণ সেল অর্ডার বসাতে হবে। ফলে মার্কেটের অন্যান্য বিক্রেতারা আতঙ্কিত হয়ে তাদের সেল অর্ডারের প্রাইস কমিয়ে দেবে। আপনি এই কম প্রাইসটা স্বর্ণের 'বাজারদর' হিসেবে প্রচার করে বেড়াবেন; সিম্পল।

দাম আরও কমলে হেজ ফান্ডগুলো তাদের হাতে থাকা স্বর্ণ বিক্রি করে দিতে শুরু করে, কারণ তাদের 'স্টপ লস' লিমিট আছে। অর্থাৎ যে সীমার পর তারা আর লসে যেতে রাজি না। এভাবে প্রাথমিক বিক্রি আরও বিক্রি অনুপ্রাণিত করে। দাম কমতে থাকে কোনো কারণ ছাড়াই। একমাত্র কারণ—কেউ একজন চাচ্ছে দাম কমাতে! ম্যানিপুলেশন।

কাগুজে স্বর্ণ বিক্রির জন্য বিক্রেতাদের হাতে কিছু বাস্তব স্বর্ণ থাকতে হয়। একে বলা হয় ফ্লোটিং সাপ্লাই। দিনদিন কাগুজে স্বর্ণের ফ্লোটিং সাপ্লাই কমছে। কারণ বড়

বড় ডিলাররা ওয়্যারহাউজ থেকে স্বর্ণ নিয়ে সেগুলো সরাসরি বিক্রি করে দিচ্ছে। প্রথমত তারা লন্ডন বুলিয়ন মার্কেট অ্যাসোসিয়েশন বা এরকম মার্কেটপ্লেস থেকে স্বর্ণের শেয়ার কিনে নিচ্ছে, তারপর শেয়ারের বিপরীতে থাকা ফিজিক্যাল গোল্ড উঠিয়ে নিয়ে চীন-রাশিয়া বা অন্য ক্রেতার নিকট বিক্রি করছে।

হেজ ফান্ড (Hedge Fund) ম্যানিপুলেশন

সহজ কথায়—হেজ ফান্ড হচ্ছে সমন্বিত পুঁজি বিনিয়োগ। উদাহরণত, একজন গোল্ড মার্কেট খুব ভালো বুঝে এবং এখানে সে লেনদেনও করে, প্রচুর লাভ কামায়। তাকে দেখে আরও কয়েকজন উদ্‌বুদ্ধ হয়েছে স্বর্ণের বাজারে বিনিয়োগ করতে। কিন্তু তারা এই ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা যা করবে—অভিজ্ঞ লোকটিকে নিজেদের টাকা দেবে। সবার টাকা মিলে যৌথ ফান্ড হবে, এটিই হেজ ফান্ড। হেজ ফান্ডগুলো ম্যানেজমেন্ট বাবদ একটা ফি নিয়ে থাকে, এটি তাদের আয়। শুধু ফি থেকেই তারা মিলিয়ন মিলিয়ন আয় করে থাকে। স্পেশালিস্টরা মিলেও হেজ ফান্ড গড়ে তুলে।

হেজ ফান্ড যখন কোনো সেক্টরে বিনিয়োগ করে, তখন একটা সীমা নির্ধারণ করে নেয় যে তারা এরচেয়ে বেশি লস গুনবে না। একে বলা হয় স্টপ লস। যখন লাভ হয়, তখন তো লাভই। কিন্তু যদি দাম কমতে থাকে, তখন স্টপলস পয়েন্টে পৌঁছলে তারা আর পণ্য ধরে রাখে না, বিক্রি করে দেয়। বর্তমানে হেজ ফান্ডগুলো স্বর্ণের বাজারে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। আগে এমন ছিল না। আগে একদিকে ছিল ছোট ছোট বিনিয়োগকারীরা, অপরদিকে ছিল রাঘববোয়াল আর সেন্ট্রাল ব্যাংকগুলো। মাঝামাঝি পর্যায়ের বিনিয়োগকারী দরকার ছিল। হেজ ফান্ড সেই শুন্যস্থান পূরণ করছে।

হেজ ফান্ড শুধু স্বর্ণে বিনিয়োগ করে না, আরও বহু পণ্যে করে। স্টপলস পয়েন্টে চলে গেলে তারা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করেছে নাকি স্বল্পমেয়াদি তা বিবেচনা করে না। যদি কোনো হেজ ফান্ড স্বর্ণের বাজার প্রভাবিত করতে চায়, স্বল্প দামে বিশাল সেল অর্ডার বসিয়ে দেবে। দাম যখন কমতে শুরু করবে এটি হয়তো আরও অনেক হেজ ফান্ডের স্টপলস লিমিট ক্রস করবে। এক ফান্ডের স্টপলস পয়েন্টে পৌঁছে গেলে তারাও সেল অর্ডার বসাবে, দাম আরও কমবে। আরেক হেজ ফান্ডের স্টপলস পয়েন্টে পৌঁছে গেলে তারাও বিক্রি করে দেবে। তারপর? হয়তো বিক্রির হিড়িক পড়ে যাবে।

আন-অ্যালোকেটেড স্বর্ণ লিজ

আন-অ্যালোকেটেড গোল্ড হচ্ছে অবণ্টিত স্বর্ণ। অর্থাৎ ব্যাংক এই স্বর্ণ বিক্রি করবে, কিন্তু হস্তান্তর করবে না। আপনার নামে সুনির্দিষ্ট কোনো স্বর্ণের বার নেই। ফলে ব্যাংক লোনের মতো একই স্বর্ণ হয়তো ১০ বার বিক্রি হয়, বা আরও বেশি। ক্রেতারা বাস্তব স্বর্ণ সরবরাহের ঝামেলায় যেতে চায় না; কারণ একে তো এতে রিস্ক আছে, স্টোরেজ সমস্যা, পরিবহন খরচ-সহ আরও অনেক ঝক্কি। তাই ব্যাংক থেকে কিনে ব্যাংকেই রেখে দেয়। ব্যাংকও খুশি মনে এক স্বর্ণ সবাইকে দিয়ে বেড়ায়।

সেন্ট্রাল ব্যাংকগুলো কখনো কখনো বিক্রি করার পরিবর্তে লন্ডন বুলিয়ন মার্কেট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ব্যাংকগুলোকে স্বর্ণ লিজ দেয়। কখনো লিজ কার্যক্রম পরিচালিত হয় জবাববিহীন কোনো মধ্যস্থতাকারী ব্যাংকের মাধ্যমে, যেমন দ্য ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটলমেন্ট। এরা সব ধরনের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে স্বর্ণ গিয়ে কমার্শিয়াল ব্যাংকের হাতে পৌঁছে। স্বর্ণ বলতে এক টুকরো কাগজ। এই মর্মে যে অমুক সেন্ট্রাল ব্যাংকে তাদের এত পরিমাণ স্বর্ণ মজুত আছে। এই স্বর্ণই কমার্শিয়াল ব্যাংক বিক্রি করতে শুরু করে। তাও একাধিক ক্রেতার কাছে। এভাবেই চলতে থাকে 'স্বর্ণের' কেনাবেচা!

কমবাইন্ড ম্যানিপুলেশন

ধরি এলবিএমএ-এর সদস্য কোনো ব্যাংক/ডিলার দেখতে পেল চীনে বাস্তব স্বর্ণের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাশাপাশি লন্ডনে জিএলডির (গোল্ড শেয়ার) গুদামে স্বর্ণ মজুত আছে। সে কী করবে? প্রথমে স্টক মার্কেটে স্বর্ণের দাম ম্যানিপুলেট করবে। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে তাদের জিএলডি শেয়ার বিক্রি করে দেবে। ঝানু খেলোয়াড়রা দেখলেই বুঝতে পারবে অর্থলগ্নির এই-ই মোক্ষম সময়। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা তাদের জিএলডি শেয়ার ডাম্প করতে থাকবে।

ডিলার কমদামে জিএলডি শেয়ারগুলো কিনে নিয়ে সেগুলোর বিপরীতে থাকা স্বর্ণ তুলে উচ্চমূল্যে বিক্রি করে দেবে। মধ্যকার দামের ব্যবধানটা তার মুনাফা। এ ধরনের ঘটনা ২০১৩ সালে ঘটেছে। কয়েক যুগ পরে তখন প্রথমবারের মতো স্বর্ণের দামে ধস নেমেছিল। জিএলডি ওয়্যারহাউজ তখন প্রায় ৫ হাজার টন বাস্তব স্বর্ণ বিক্রি করে দেয়। ফলে কাগুজে স্বর্ণের বিপরীতে থাকা এসব ফ্লোটিং সাপ্লাইয়ের বেশিরভাগেরই গন্তব্য হয় চীন!

অন্তরালে কে?

এতক্ষণ আমরা দেখলাম স্বর্ণের বাজার কীভাবে প্রভাবিত করা হয়। হেজ ফান্ড, লিজ, আন-অ্যালোকেটেড কন্ট্রাক্ট-সহ আরও নানা উপায়ে এগুলো করা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'কে' এবং 'কেন'। এ ক্ষেত্রে সাধারণত এলবিএমএ (লন্ডন বুলিয়ন মার্কেট অ্যাসোসিয়েশন) ব্যাংকগুলোর নাম আসে, হেজ ফান্ডও দেখা যায়। প্রফিটের আশায় তারা এসব কারসাজি করে থাকে।

এখানে কি বৃহত্তর রাজনৈতিক এবং নীতিগত প্রভাব আছে? পৃথিবীতে বর্তমানে দুটি বৃহৎ খেলোয়াড় আছে যারা স্বর্ণের দাম কম রাখতে চায়, অন্তত স্বল্পমেয়াদে হলেও। একটি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অপরটি চীন।

অনেকের ধারণা ফেডারেল রিজার্ভ স্বর্ণের দাম কমাতে চায়। কারণ স্বর্ণের দাম কম মানে হচ্ছে ডলারের দাম বেশি। অর্থাৎ অল্প ডলারে বেশি স্বর্ণ পাওয়া যাবে, স্বর্ণের চেয়ে ডলার শক্তিশালী। তো শক্তিশালী ডলারের জন্য ফেডারেল রিজার্ভ স্বর্ণের দাম কমিয়ে রাখে। আমার মতে তাদের এই পর্যবেক্ষণ ভুল। কারণ ফেডারেল রিজার্ভ শক্তিশালী ডলার চায় না, চায় দুর্বল ডলার। অর্থাৎ ইনফ্ল্যাশন চায়। মরিয়া হয়ে চায়। ডলারের দাম কম হলে পণ্য আমদানিতে খরচ পড়বে বেশি, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বৃহত্তম আমদানিকারক দেশ। আমদানিতে খরচ বেশি পড়লে পরিমিত মাত্রায় ইনফ্ল্যাশন জারি থাকবে।

তবে ফেড দুর্বল ডলার চায়—এই হাইপোথিসিসে দুটি বাধা আছে। প্রথমত, ফেড চাইল, আর ইনফ্ল্যাশন হয়ে গেল ব্যাপারটা এমন নয়। মার্কেটের নিজস্ব ডিফ্ল্যাশনারি উপাদান সক্রিয়। যেমন জনসংখ্যা, টেকনোলজি, ঋণ ইত্যাদি। এগুলো ফেডের ইনফ্ল্যাশনারি পলিসির বিপরীত শক্তি। দ্বিতীয় বিপরীত শক্তি হচ্ছে—অন্যান্য দেশও দুর্বল মুদ্রা চায়, তাদের নিজস্ব অর্থনীতির কল্যাণার্থে। শুধু যুক্তরাষ্ট্র একচেটিয়াভাবে কারেন্সির দাম কমিয়ে যাবে, বাকি দেশ বসে বসে দেখবে, তা হবে না। এখানেই লুকিয়ে আছে আধুনিক কারেন্সিওয়ার বা মুদ্রাযুদ্ধের শেকড়। কারণ দুটি দেশের মুদ্রা একই সময়ে পরস্পরের তুলনায় কমদামি হবে না। একটি মুদ্রা কমদামি হলে, অপরটির মূল্য অবশ্যই এরচেয়ে বেশি হবে।

দীর্ঘমেয়াদে স্বর্ণের বর্ধিত মূল্য ধরে রাখার ক্ষেত্রে ফেডের একটা শর্ত রয়েছে—অবশ্যই তা হতে হবে নিয়মতান্ত্রিক। স্বর্ণের ধীর, ক্রমানুবর্তী মূল্য বৃদ্ধিতে (ডলারের ধীর, ক্রমানুবর্তী মূল্যহ্রাস/ইনফ্ল্যাশন) ফেডের আপত্তি নেই। সমস্যা তখনই বাধে যখন একদিনে এক লাফে স্বর্ণের দাম আউন্সপ্রতি ১০০ ডলার বেড়ে যায়। ফেড তড়িঘড়ি মূল্যের লাগাম টেনে ধরার উদ্যোগ নেয়। সফলতা-ব্যর্থতার দায় ভবিষ্যতের কাঁধে।

সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে ২০১১ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এ সময় স্বর্ণের দাম বেড়ে আউন্সপ্রতি ১৭০০ ডলার থেকে ১৯০০ ডলারে পৌঁছে। ২ হাজার ডলার ছোঁয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। যদি ২ হাজারে পৌঁছে যায়, তবে তা ৩ হাজার পর্যন্ত উঠার সম্ভাবনা ছিল। এটি স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নয়। ফলে ফেড হস্তক্ষেপ করে দাম কমানোর চেষ্টা করেছে। এরকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফেড মার্কেট ম্যানিপুলেট করে থাকে। এ ছাড়া স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে কোনো সমস্যা নেই।

এখন মূল খেলোয়াড়দের নিয়ে আলোচনা করা যাক। পূর্বেই বলেছি চীনের স্বর্ণ কেনা এখনো ফুরায়নি। হয়তো যুক্তরাষ্ট্রের সমান হতে তার আরও কয়েক হাজার টন স্বর্ণ দরকার। তাই যতদিন না তার কোটা পূর্ণ হচ্ছে, ততদিন সে মার্কেট ম্যানিপুলেট করে দাম কম রাখতে চেষ্টা করে যাবে।

আন্তর্জাতিক পলিসিতে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের এই দ্বৈরথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একদিকে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ এবং মার্কিন ট্রেজারি চায় ইনফ্ল্যাশন, যেন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা সহজ হয়, চাপ কমে। অপরদিকে চীন চায় না ডলারের ইনফ্ল্যাশন ঘটুক। কারণ চীন কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের মার্কিন ট্রেজারি নোট কিনে রেখেছে। যদি ডলারের দাম কমে, তবে চীনের এই রিজার্ভেরও দাম কমবে।

ফলে যদি চীন দেখে ইনফ্ল্যাশন বেড়ে যাচ্ছে, সে তার হাতে থাকা ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের ট্রেজারি বিক্রি করতে শুরু করবে, ফলে হয়তো যুক্তরাষ্ট্রে সুদহার বৃদ্ধি পাবে, স্টক এবং হাউজিং মার্কেট ধাক্কা খাবে। ইনফ্ল্যাশনের ফলে ট্রেজারির দরপতনের মোকাবিলায় রক্ষাকবচ চীন স্বর্ণ কিনে রাখছে। এখন তার হাতে ট্রেজারি এবং স্বর্ণ দুটিই আছে। যদি ট্রেজারির দাম স্থিতিশীল থাকে, তাহলে তো চীনের রিজার্ভ সংরক্ষিতই। আর যদি ট্রেজারির দাম কমে যায় এবং স্বর্ণের দাম বেড়ে যায়; তবুও চিন্তা নেই, চীনের হাতে রয়েছে প্রভূত স্বর্ণ। এভাবে চীন তার বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। উভয়দিকে বিনিয়োগ করে ভারসাম্য ধরে রেখেছে। অন্যান্য বিনিয়োগকারীদেরও ঠিক একই কাজ করা উচিত। চীনের অনুসরণ করে স্বর্ণ কিনে রাখা উচিত।

অনেকের ধারণা চীন হয়তো স্বর্ণভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালুর জন্য স্বর্ণ কিনছে, ভুল। অন্তত স্বল্পমেয়াদে। বরং স্বর্ণ কিনছে ব্যালান্স করার জন্য। ফলে এখানে অদ্ভুত দ্বৈতব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। যদিও মার্কিন ট্রেজারি চায় না চীনের হাতে স্বর্ণ যাক, কিন্তু যতদিন না চীনের স্বর্ণ কেনা ফুরাচ্ছে ততদিন সেও চায় স্বর্ণের দাম স্থিতিশীল থাকুক। নয়তো চীন ট্রেজারি ডাম্প করে মার্কিন বাজার ধসিয়ে দেবে। এই বিষয়টা আমি আইএমএফ এবং ফেডের সিনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করেছি। তারা

আমার মত সমর্থন করেছেন। বলেছেন এখানে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে যৌথ বোঝাপড়া আছে। উভয়েই যথাযথভাবে স্বর্ণের বাজার নিয়ন্ত্রণে একমত। যুক্তরাষ্ট্র চীনকে মার্কেট ম্যানিপুলেটের সুযোগ দিতে হচ্ছে যেন চীন কমদামে স্বর্ণ কেনা অব্যাহত রাখতে পারে।

কিন্তু কথা হচ্ছে এই ম্যানিপুলেশনের শেষ কোথায়? ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীরা কী করবে?

ম্যানিপুলেশনরোধ

যখন আমেরিকা-চীনের মতো সুপারপাওয়ার মার্কেট ম্যানিপুলেশনে নেমে গেছে, সেখানে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা যাবে কই? এজন্য অনেককে বলতে শোনা যায়—আমরা তাদের বিরুদ্ধে খেলায় জিততে পারব না, ফলে খেলার বাইরে থাকাই উচিত। স্বর্ণ বিনিয়োগ আমাদের জন্য নয়।

স্বল্পমেয়াদে কথাটা যদিও সঠিক, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে ভুল। কারণ ম্যানিপুলেশনের একটি সর্বোচ্চ সীমা আছে, এটি সবসময়ই সীমিত। কারণ হয়তো ম্যানিপুলেটরদের স্বর্ণের মজুত কমছে, নয়তো কাঙ্ক্ষিত ইনফ্ল্যাশনে কোনো ধরনের পরিবর্তন বড়সড় দরবৃদ্ধি ডেকে আনতে পারে। ম্যানিপুলেটরদের তেলেসমাতি এখানেই সমাপ্ত।

ইতিহাস বলে ম্যানিপুলেটররা দীর্ঘসময় টিকে থাকতে পারলেও শেষমেশ হাল ছাড়তে বাধ্য হয়। ১৯৬০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণ ডাম্পিং করা সত্ত্বেও লন্ডন গোল্ড পুল ব্যর্থ হয়েছে। নব্বইয়ের দশকে, শূন্য দশকের প্রারম্ভে সেন্ট্রাল ব্যাংকের ম্যানিপুলেশনও ব্যর্থ হয়েছে। ফলে ১৯৬৮ সালে যে স্বর্ণ ছিল আউন্সপ্রতি ৩৫ ডলার, সব ধরনের ম্যানিপুলেশন সত্ত্বেও ২০১১ তে এসে এর মূল্য দাঁড়িয়েছে আউন্সপ্রতি ১৯০০ ডলার! যদিও ম্যানিপুলেশনের নিত্যনতুন টেকনিক আবিষ্কৃত হচ্ছে, কিন্তু দিনশেষে সবগুলো ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আরেকটি বাধা হচ্ছে পেপার ম্যানিপুলেশনের জন্য অন্তত কিছু হলেও বাস্তব স্বর্ণ প্রয়োজন। হোক সেটা কাগুজে স্বর্ণের এক পার্সেন্ট, কিন্তু প্রয়োজন। এই স্বর্ণ দিনদিন কমে যাচ্ছে, কারণ অনেক দেশ বাস্তব স্বর্ণ কিনে নিচ্ছে। ফলে কাগুজে স্বর্ণ বিক্রির সক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। যেমন ২০১৩ সালে স্বর্ণের বাজারে কারসাজি করার জন্য জিএলডি ৫ হাজার টন স্বর্ণ ডাম্প করেছে। ২০১৪ সালে পুনরায় স্বর্ণের দামে অস্থিরতা তৈরি হলে জিএলডি কোনো স্বর্ণ বিক্রি করতে পারেনি। কারণ তার হাতে তখন আছে মাত্র ৮ হাজার টন, এ থেকে আরও ৫ হাজার টন

বেচে দিলে নিজের ভান্ডারেই টান পড়বে। তখন কৃত্রিম কাগুজে লেনদেন করতে গিয়ে স্পন্সরদের আস্থা অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত স্বর্ণ তার হাতে থাকবে না।

তৃতীয় পয়েন্ট হচ্ছে ম্যানিপুলেশন-ম্যানিপুলেশন খেলা বন্ধ হয়ে যাবে যখন চীনের হাতে পর্যাপ্ত স্বর্ণ মজুত হয়ে যাবে। এর গোল্ড টু জিডিপি রেশিও যুক্তরাষ্ট্রের সমান বা বেশি হয়ে যাবে। কারণ তখন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মিলে স্বর্ণের দাম চাপিয়ে রাখার রাজনৈতিক কোনো কারণ থাকবে না। ফলে এককভাবে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা চীন চাইলে বাজার অস্থির করে দিতে পারবে। এখন যদি স্বর্ণের দাম বাড়ে, চীন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু তখন যতই দাম বাড়ুক, নো টেনশন। বরং যখন চীনের হাতেও ৮ হাজার টন বা আরও বেশি স্বর্ণ মজুত হয়ে যাবে, চীন-যুক্তরাষ্ট্র হ্যান্ডশেক করে বলতে পারে—এবার ডলারের দাম বাড়ানো যাক।

বিনিয়োগকারীদের জন্য আমার পরামর্শের সারকথা হচ্ছে—স্বর্ণের বোঝাপড়া অত্যন্ত আবশ্যক। কীভাবে ম্যানিপুলেশন হয়, কোথায় এর সমাপ্তি, বাস্তব স্বর্ণের চাহিদা-জোগান কেমন হতে পারে, এগুলো বুঝতে হবে। তাহলে আপনি চোখের সামনে এন্ডগেইম দেখতে পাবেন এবং সে অনুযায়ী বিজনেস মডেল সাজাতে পারবেন।

* * *

অষ্টম অধ্যায়

স্বর্ণ স্থিতিস্থাপক

২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত স্বর্ণের দাম চারবার ১১৫০ ডলার থেকে ১০৫০ ডলারে নেমে এসেছে। কিন্তু প্রতিবারই আবার উঠে গেছে। এ থেকে বুঝা যায় চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও স্বর্ণের ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা আছে। অনেক বিনিয়োগকারী তখন হতাশ হয়ে বলেছিল স্বর্ণের দাম পড়ছে কেন? অন্যান্য পণ্যের তুলনায় স্বর্ণের তেমন দরপতন হয়নি, তাই তাদের বরং আশাবাদি হওয়া উচিত ছিল যে অধিকতর দরপতন হয়নি। অতীতেও অর্থব্যবস্থার পতনের পর স্বর্ণ স্বীয় স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে পেরেছিল, ভবিষ্যতেও পারবে। বিশেষত সাইবার ফিনান্সিয়াল যুদ্ধের এই যুগে।

সাইবারফিনান্সিয়াল ওয়ার

২০১৩ সালের ২২ আগস্ট। আমেরিকান স্টক মার্কেট ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব সিকিউরিটিজ ডিলার্স অটোমেটেড কোটেশন্স বা সংক্ষেপে NASDAQ (আমরা ন্যাসড্যাক বলব), যা বিশ্বব্যাপী ইলেক্ট্রনিক সিকিউরিটিজ লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, কোনো কারণ ছাড়াই আধাদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। আজ অবধি তারা কোনো কারণ দর্শায়নি। মুখরক্ষার জন্য শুধু এটুকু বলেছে যে সেখানে নাকি 'ইন্টারফেস প্রব্লেম' হয়েছিল।

তবে সচেতন নাগরিকদের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা না যে, এখানে নিশ্চয় গুরুতর কিছু ঘটেছে। হতে পারে তা চাইনিজ বা রুশ সেনাবাহিনীর সাইবার ব্রিগেডের আক্রমণ! নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা দেখে আসি আদতে কী ঘটেছিল।

২০১৪ সালে ব্লুমবার্গ বিজনেস একটি আর্টিক্যাল ছাপে, শিরোনাম ছিল—দ্য ন্যাসড্যাক হ্যাক। যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা ছিল ২০১০ সালের। সেদিন আসলে কী ঘটেছে মিডিয়া প্রথমবারের মতো তা জানতে পারে চার বছর পর, ২০১৪ সালের জুলাইতে। এফবিআই, এনএসএ এবং ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সহায়তায় ন্যাসড্যাক আক্রমণের উৎস খুঁজে পায়—কম্পিউটারে ভাইরাস! এটি কোনো ক্রিমিনাল গ্রুপ ইন্সটল করেনি, করেছে রাশিয়া।

সরকারি কর্তারা যখন এ জাতীয় রিপোর্ট প্রকাশ করে, সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা নিয়েই করে। প্রশ্ন হচ্ছে চার বছর পর কেন এই ঘটনা প্রকাশ করা হলো? এবং প্রকাশের মাধ্যমে সরকার বিনিয়োগকারীদের কী বার্তা দিতে চায়? সরকার মূলত বিনিয়োগকারীদেরকে সতর্ক করতে চেয়েছে, মার্কিন অর্থব্যবস্থার কত গভীরে রাশিয়ার হাত পৌঁছে গেছে সে বিষয়ে হুঁশিয়ার করতে চেয়েছে।

ভারিক্কিচালের ‘গবেষকরা’ তাৎক্ষণিক আবিষ্কার করে ফেললেন—যদি রাশিয়া আমাদের দেশে সাইবার অ্যাটাক চালায়, আমরা কম কীসে? আমাদের হ্যাকাররা তাদের চেয়েও দক্ষ, আমরাও পালটা হামলা চালাব। যদি তারা নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ করে দেয়, আমরাও মস্কো স্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ করে দেবো। এটা সত্য যে মার্কিন হ্যাকাররা বিশ্বের যেকোনো হ্যাকারদের চেয়ে দক্ষ। কিন্তু কথা হচ্ছে তারা আমাদের বাজার বন্ধ করে দিলো, আমরা তাদেরটা করে দিলাম, ক্ষতি কার? অবশ্যই আমাদের।

কারণ আমাদের বাজার বিশ্বের যেকোনো বাজারের চেয়ে ঢের বড়। আমাদের বাজারে সম্পদের পরিমাণও প্রচুর। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত আমরাই বেশি হব, এবং এরকম আক্রমণ আমাদের দেশের অন্যান্য সেক্টরকে বেশি প্রভাবিত করবে। রাশিয়া বর্তমানে যে অর্থনৈতিক অবস্থানে আছে, তার হারানোর অত কিছু নেই।

প্রতিশোধ নেওয়া এবং সাইবার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, নয়তো চূড়ান্ত লুজার হবে আমেরিকা। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই বিষয়টা খুব ভালোভাবেই বুঝে। এজন্যই ২০১৪ সালে সে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে ক্রিমিয়া অভিযান চালিয়েছে। সে জানে আমেরিকা অধিকতর জল ঘোলা করতে আগ্রহী হবে না।

শীতলযুদ্ধের সময়ও এই দ্বৈরথ চলমান ছিল। তখন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে রাশিয়াকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত মিসাইল ছিল, রাশিয়ার হাতেও যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেওয়ার মতো মিসাইল ছিল। এটি খুবই ভয়ানক পরিস্থিতি। কারণ এটি উভয় পক্ষকে লাগাতার ‘প্রথম’ আক্রমণে উসকানি দিত। যে আগে আক্রমণ করবে, সেই জিতবে। এই অবস্থার অবসানে প্রয়োজন ছিল ‘সেকেন্ড স্ট্রাইক ক্যাপাবিলিটি’ বা প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করে দ্বিতীয় আক্রমণ করার সক্ষমতা। যদি উভয় দেশেরই এই ক্ষমতা থাকে যে সে শত্রুরাষ্ট্রের প্রথম মিসাইল আক্রমণ কাটিয়ে উঠে পালটা আক্রমণ করতে পারবে, তবে কোনো দেশই আক্রমণ করতে ইচ্ছুক হবে না। একে বলা হয় Mutually Assured Destruction (MAD) বা পারস্পরিক ধ্বংসসাধন সক্ষমতা।

বর্তমান সাইবার ফিনান্সিয়াল যুদ্ধেও এই স্ট্রাটেজি প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু সক্ষমতার 'সমতা' ক্ষয়ক্ষতির সমতার নিশ্চয়তা দেয় না। উভয় পক্ষের ক্ষমতা যদিও সমান, কিন্তু ক্ষতির পাল্লা সমান নয়।

দ্বিতীয় আশঙ্কা, এবং সবচেয়ে গুরুতর আশঙ্কা হচ্ছে—অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণ। অ্যাক্সিডেন্টালি শুরু হয়ে যাওয়া যুদ্ধ। কোনো পক্ষই হয়তো চায়নি, কিন্তু দুর্ঘটনাবশত ঘটে গেছে। আর দুর্ঘটনা যেকোনো সময়ই ঘটতে পারে। সবসময়ই আশঙ্কা বিদ্যমান!

তৃতীয় সমস্যা হলো সাইবার যুদ্ধের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যদিও যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আছে, মিলিটারি সাইবার কমান্ড আছে, ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি আছে, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ স্ট্রাটেজিস্ট নেই, নীতিনির্ধারক নেই। শীতল যুদ্ধকালে ষাটের দশকে হারম্যান এবং হেনরি কিসিঞ্জার মিলে যথেষ্ট পরিমাণ স্ট্রাটেজিক নিউক্লিয়ার ফাইটিং ডকট্রিন গড়ে তুলেছিল। কিন্তু বর্তমানে সাইবার ওয়ারফেয়ার পরিচালনার জন্য যথেষ্ট নীতিনির্ধারক নেই, ফলে স্ট্রাটেজিও নেই। থাকার মধ্যে আছে সেন্টার অন স্যাঙ্কশন অ্যান্ড ইলিসিট ফিন্যান্সের জুয়ান জারাত এবং সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের জিম লুইস। এই কৌশলগত অপ্রতুলতা সাইবার যুদ্ধের রিস্ক বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে স্বর্ণসঞ্চয়ের আরও একটি যৌক্তিকতা প্রতিভাত হয়—স্বর্ণ হ্যাক করা যায় না।

ডলার পরিত্যাগ

যদিও শুনতে অদ্ভুত মনে হয়, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ২০১০ সাল থেকে মার্কিন সরকার 'শক্তিশালী-ডলার' নীতি পরিত্যাগ করেছে। ১৯৮০ সাল থেকে চলে আসা শক্তিশালী-ডলার নীতি সে বছর জানুয়ারিতে পরিত্যাজ্য হয়। ইনফ্ল্যাশন এবং নমিনাল প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে 'সুলভ-ডলার' নীতির সূচনা হয়। ২০০৯ সালে পিটসবার্গে অনুষ্ঠিত জি টুয়েন্টি সম্মেলনে বিশ্ব নেতারা এই নীতিতে সম্মত হন। তাদের যুক্তি হলো, যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনীতি। এখানে ধস নামলে সর্বত্র ধস নামবে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা প্রয়োজন যেন গোটা বিশ্বে প্রবৃদ্ধি চলমান থাকে। তাই শক্তিশালী-ডলার নীতি বাদ দেওয়া হয়।

তখন থেকেই সুলভ-ডলার নীতি কারেন্সি ওয়ার বা মুদ্রাযুদ্ধ উসকে দিয়েছে। কারণ এক দেশ কারেন্সির দাম কমালে অন্য দেশও কমায়। মুদ্রাযুদ্ধের সমস্যা হলো, এর কোনো শেষ নেই, কোনো যৌক্তিক উপসংহার নেই। পাশাপাশি ডলারের প্রভাব ক্ষুণ্নকরণ এবং বৈশ্বিক রিজার্ভ কারেন্সি ডলারের পতন ঘটাতে বিশ্বব্যাপী অনেক কার্যক্রম ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আমাদের বহু বিজনেস পার্টনার,

অর্থায়নকারী, বিনিয়োগকারী ডলারের ওপর আস্থা হারিয়েছে। মার্কিন সরকারের কর্মপন্থায় তারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

উদাহরণ ২০১৪ সালের ঘটনা উল্লেখ করা যায়। সে বছর যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের বৃহত্তম ব্যাংকগুলোর একটি—বিএনপি প্যারিবাস থেকে নয় বিলিয়ন ডলার তুলে নিয়ে আসে। অভিযোগ? তারা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবরোধ লঙ্ঘন করেছে! ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও ইরান মিলে লেনদেন করেছে। ইরানের ওপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যদিও তিন দেশের কেউই মার্কিন আইনের আওতাধীন নয়। কিন্তু ফ্রান্স ও ইরান লেনদেনটা করেছিল ডলারে। ডলার সরবরাহ হবে একটি সেটলমেন্ট সিস্টেমের ভেতর দিয়ে যা নিয়ন্ত্রণ করে ফেডারেল রিজার্ভ এবং মার্কিন ট্রেজারি। আমেরিকার ভাষ্যমতে এটি আমেরিকার আইনের আওতাধীন। এই ঘটনা ফ্রান্সে তীব্র জনরোষ তৈরি করেছিল।

কোনো সন্দেহ নেই যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সহযোগীরা এসব অবরোধে ত্যক্তবিরক্ত। নিজেদের ব্যবসায় আমেরিকার দাদাগিরিতে তারা অতিষ্ঠ। ডলারের ওপর ক্ষুব্ধ। ফলে বিদেশি ব্যাংকগুলো যতদ্রুত সম্ভব নিজেদেরকে ডলার সিস্টেম থেকে সরিয়ে নিচ্ছে।

ডলারের দাদাগিরি

দুটি সার্বভৌম দেশের মধ্যকার বাণিজ্য অর্থায়ন হচ্ছে নিছক সংখ্যার খেলা। আমি জাহাজ ভরে আপনার দেশে পণ্য পাঠালাম, আপনি আমাকে মূল্য শোধ করতে হবে, আমার দেশের কারেন্সিতে। আপনি আমার দেশে পণ্য প্রেরণ করলেন, আমি আপনার দেশের মুদ্রায় তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। দুটি ভিন্ন মুদ্রায় লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে, এখন দুই মুদ্রার বিনিময় হার কী হবে তা নির্ধারণ করে আমাদের ইচ্ছার ওপর। আমরা আমাদের ইচ্ছামতো তৃতীয় কোনো কিছুর মাধ্যমে পারস্পরিক বিনিময় হার ফিক্সড করে নিতে পারি। এটিই ব্যালান্স অব ট্রেড, যা নিয়মিত বিভিন্ন দেশের মাঝে হয়ে থাকে।

তৃতীয় বস্তুটি হতে পারে ডলার, হতে পারে বেজবল কার্ড কিংবা হতে পারে বোতলের ছিপি! গণনাযোগ্য যেকোনো কিছু হতে পারে, উভয় পক্ষের সম্মতি থাকলেই হলো। এর সহজ অর্থ হচ্ছে 'ট্রেড কারেন্সির' তালিকা অনেক দীর্ঘ। চিনা ইয়ান সবদিক থেকে যোগ্য। ট্রেড কারেন্সি আর রিজার্ভ কারেন্সি এক নয়। ট্রেড কারেন্সি হচ্ছে নিজেদের মধ্যকার ট্রেড ব্যালান্সের মাধ্যম। পক্ষান্তরে রিজার্ভ কারেন্সি হচ্ছে আপনার অতিরিক্ত সম্পদ বিনিয়োগের মাধ্যম। রিজার্ভ কারেন্সি হতে হলে গভীর তারল্য, বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের প্রাচুর্য থাকতে হয়। ফলে চিনা ইয়ান এখনো রিজার্ভ কারেন্সি হওয়ার উপযুক্ত নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার অনেক বড়। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি মার্কেট বিশ্ববাজারে সম্পাদিত সমস্ত বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ থেকে সৃষ্ট পুঁজির ধারা ধারণ করে নিতে সক্ষম। বিশ্বের আর কোনো বাজার এত বড় নয়। জাপান, চীন, তাইওয়ান-সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের রিজার্ভের পরিমাণ ট্রিলিয়ন ডলারে হিসাব করতে হয়, যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি মার্কেট ছাড়া বিশ্বের আর কোনো বাজার আপাতত এত তারল্যপ্রবাহ ধারণ করতে সক্ষম না।

উল্লেখ্য—অর্থের তারল্য বলতে বোঝানো হয় অর্থের ব্যয়যোগ্যতা। ধরুন আপনি একটি খাট কিনবেন, আপনার হাতে টাকা নেই, আছে ধান। তো আপনি চাচ্ছেন ধান দিয়ে খাট কিনতে, সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে খাটবিক্রেতার ধান প্রয়োজন নেই। ফলে আপনি আপনার ধান যখন খুশি 'ব্যয়' করতে পারছেন না। অর্থাৎ ধানের তারল্য বা ব্যয়যোগ্যতা কম। পক্ষান্তরে আপনার হাতে যদি টাকা থাকে, যা খুশি কিনতে পারবেন। দেশের সব নাগরিক, সব ব্যবসায়ী টাকা গ্রহণ করবে। ফলে দেখা যাচ্ছে টাকার তারল্য বা ব্যয়যোগ্যতা বেশি।

নিঃসন্দেহে রাশিয়া, চীন এবং অন্যান্য দেশ ডলারের দাদাগিরি থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক। তারা এমন কোনো সিস্টেম গড়ে তুলতে আগ্রহী যা ডলারভিত্তিক হবে না। কিন্তু দিল্লি এখনো বহুদূর। কারণ চীনের ৩.২ ট্রিলিয়ন সমমূল্যের রিজার্ভে ২ ট্রিলিয়নই ডলার। বাকিগুলো স্বর্ণ, ইউরো এবং অন্যান্য সম্পদ। ফলে আমেরিকা যদি ডলারে ইনফ্ল্যাশন ঘটায়, চীন বিপদে পড়বে।

রাশিয়া ডলার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে আগ্রহী, কারণ ২০১৫ সালে পূর্ব ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়ায় তার উচ্চাকাঙ্খায় যুক্তরাষ্ট্র বাধা দিয়েছে এবং ডলার ও ইউরোভিত্তিক অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছে। ২০১৩ সালে ওবামা যখন ইরানকে আঞ্চলিক শক্তি স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর এবং ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প জারি রাখার অনুমতি দিয়েছে সেই থেকে সৌদিও নাখোশ। সৌদি একে পেছন থেকে ছুরিমারা এবং বিশ্বাসঘাতকতা বিবেচনা করেছে।

১৯৭০-এর দশকের শেষদিকে প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং ফোর্ডের প্রশাসনের সাথে সৌদির গোপন চুক্তি হয়েছিল। যা পেট্রোডলার চুক্তি নামে পরিচিত। এর সারকথা ছিল—আমেরিকা সৌদির জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, বিনিময়ে সৌদি শুধু ডলারেই তেল বিক্রি করবে। পূর্বেও আমরা এই চুক্তির ইতিহাস জেনেছি। ওবামা কর্তৃক ইরানকে আঞ্চলিক সুপারপাওয়ার স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টা সৌদি এই চুক্তির বরখেলাপ বিবেচনা করেছে। ফলে তারাও এখন ডলার থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছুক।

ফলে দেখা যাচ্ছে রাশিয়া, চীন, ইরান, সৌদি আরবের মতো শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ দেশ যারা বিশ্ববাণিজ্যে তেল, গ্যাস ও অন্যান্য মূল্যবান পণ্যের শীর্ষস্থানীয় উৎপাদক, ডলারের প্রভাব খর্ব করতে সবাই একাট্টা। আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় সবাই ডলারের বিকল্প খুঁজছে।

২০০৯ সালে আমি পেন্টাগনের প্রথম ফিনান্সিয়াল ওয়ার গেম ডিজাইনারদের একজন। পেন্টাগনের ইতিহাসে এটি প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক 'অর্থনৈতিক যুদ্ধখেলা' ছিল। আমি ছিলাম চাইনিজ টিমে, আমার কলিগরা ছিল রাশিয়ান টিমে। আমরা মিলে চাইনিজ-রাশিয়ান একটি সমন্বিত গোল্ড রিজার্ভ ডিজাইন করেছিলাম। সেগুলো সুইস ভল্টে রেখে, লন্ডন ব্যাংক থেকে নতুন ধরনের মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলাম যার বিপরীতে ছিল স্বর্ণ।

তারপর চীন-রাশিয়া মিলে ঘোষণা দেয় যে যারা যারা তাদের সাথে ব্যবসা করতে চায়, তাদের পণ্য কিনতে চায়, তারা অবশ্যই নতুন প্রবর্তিত মুদ্রাব্যবস্থার অধীনে লেনদেন করতে হবে। নতুন প্রবর্তিত মুদ্রা সংগ্রহ করতে হবে। নয়তো ধার নিতে হবে। কিংবা রাশিয়া-চীনের ভল্টে নিজেদের স্বর্ণ রেখেও নতুন মুদ্রা অর্জন করতে পারে।

যদি এটি বাস্তবে ঘটে, আপনি সহসাই নতুন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের মুখোমুখি হবেন। আপনি এটি ব্যবহার করতে বাধ্য হবেন, যদি রাশিয়ান-চাইনিজ পণ্য কিনতে চান। হয়তো চীন-রাশিয়ার মুদ্রা শীঘ্রই বাজারে আসছে না। কিন্তু আমাদের গেমের মূল উদ্দেশ্য ছিল বক্সের বাইরে গিয়ে চিন্তা করতে শেখানো এবং পেন্টাগনকে সুদূর ভবিষ্যতের দৃশ্য দেখানো। সে সময় আমার সাথে যারা অংশ নিয়েছে, তাদের অনেকেই ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে। তাদের বেশিরভাগই দেশের সম্মানিত অর্থনীতিবিদ। এসব শিক্ষাবিদ গুরুদের এককথা—আমরা হাস্যকর কাজকর্ম করছি, স্বর্ণ কখনোই আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার অংশ হবে না। সবার সময় নষ্ট করার অভিযোগে আমাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

ভালো। আমরা ভবিষ্যতের 'খেলা' দেখার অপেক্ষায় রইলাম। তবে কিছু তথ্য জেনে রাখুন। ২০০৯ সালের পর থেকে রাশিয়া স্বর্ণের মজুত বাড়িয়েছে মাত্র ১০০ গুণ! চীন বাড়িয়েছে কয়েকশগুণ। চীন-রাশিয়া ঠিক সেই আচরণই করছে, যা আমরা তখন পূর্বাভাস দিয়েছিলাম। তারা আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থার ধ্বংস দেখতে পাচ্ছে, এবং সেভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছে। স্বর্ণ মজুত করছে। বিনিয়োগকারীদের উচিত এ থেকে শিক্ষা নেওয়া।

এর অর্থ এই নয় যে আগামীকাল ভোরে উঠে দেখব আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থা মড়মড় করে ভেঙে পড়ছে। রাশিয়ান রুবল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে পরিণত হয়েছে। আমি

জানি এখানে অনেক সমস্যা রয়েছে। রাশিয়ার তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো বন্ড মার্কেট নেই। দুর্নীতি প্রচুর। আইনের শাসন ভঙ্গুর। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে রাশিয়া এবং চীন ক্রমাগত ডলার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং স্বর্ণের নিকটবর্তী হচ্ছে।

২০১৪ সালের জুলাইতে আমরা এর প্রমাণ পাই। চীন এবং রাশিয়া কয়েক বছরের জন্য মাল্টিবিলিয়ন ডলারের তেল-গ্যাস বাণিজ্যচুক্তি করেছে। তারপর রাশিয়া ইরানের সাথে অনুরূপ চুক্তি করেছে। যদিও পরিমাণে আগেরটার মতো অত বড় না, কিন্তু নেহাত ছোটও না। তখন রাশিয়া-ইরান উভয়ে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। ইরানকে ডলার পেমেন্ট সিস্টেমের বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তেল-গ্যাস ছাড়াও অস্ত্র, পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর, স্বর্ণ এবং খাদ্যপণ্যের ওপর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, ডলার সিস্টেম ছাড়াই।

অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে রাশিয়া কেন ইরানের তেল কিনবে? রাশিয়া নিজেই তো বিশ্বের বৃহত্তম তেল রপ্তানিকারকদের একটি। উত্তর হচ্ছে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরান খোলাবাজারে তেল বিক্রি করতে পারছিল না। তাই সেটা রাশিয়ার মধ্যস্থতায় চীন ও অন্যান্য ক্রেতাদের নিকট বিক্রি করেছে। কোনটা রাশিয়ান তেল, আর কোনটা ইরানি তেল, পার্থক্য করার জো নেই।

অতি সম্প্রতি চীন সুইজারল্যান্ডের সাথে চুক্তি করেছে। ফলে চাইনিজ ইয়ানের সাথে সুইস ফ্রাঙ্ক বিনিময় করতে পারবে। সুইস ফ্রাঙ্ক বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী এবং কাঙ্ক্ষিত মুদ্রা। এবার চলুন বিন্দুগুলো জোড়া দিই। ইরান রাশিয়ায় তেল পাঠাবে, সেই তেল রাশিয়া বিক্রি করবে চীনের নিকট। চীন রাশিয়াকে পেমেন্ট দেবে ইয়ানের পরিবর্তে সুইস ফ্রাঙ্কে। সেটা রাশিয়া ব্রিকস ব্যাংক থেকে অন্য যেকোনো মুদ্রায় পরিবর্তন করে নিতে পারবে। ব্রিকস হচ্ছে ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চীন এবং সাউথ আফ্রিকার মতো উদীয়মান অর্থনৈতিক নীলতিমিদের সংগঠন। ব্রিকসের পক্ষ থেকে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক নামে নতুন ব্যাংক খোলা হয়েছে। ইরান-রাশিয়া-চীন হয়ে বাণিজ্যের এই যে নতুন মাত্রা, এখানে কি কিছু বাদ পড়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, একটা জিনিস বাদ পড়ে যাচ্ছে—ডলার। এই নতুন কমার্স চেইনের কোথাও ডলারের অস্তিত্ব নেই!

এইসব দেশ মিলে ডলারের দাদাগিরি ছুটাতে পর্দার অন্তরালে নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে যাচ্ছে। অথচ যুক্তরাষ্ট্র নাকে তৈল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখবে ডলারের দাম 'স্বাধীনভাবে' পড়ছে তো পড়তেই আছে। তারা হয়তো চোখ কচলে ভাবতে চেষ্টা করবে—এমন হচ্ছে কেন, এমন তো হবার কথা নয়। এটি ঘটবেই, নিঃসন্দেহে। যদি ডলারের ওপর আত্মবিশ্বাস চলে যায়, দরপতন ঘটে, তবে গোটা বিশ্বের অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজার উধাও হয়ে যাবে। আমি সেই দিনের প্রত্যাশায় আছি।

উদীয়মান বাজারের ভূমিকা

আমেরিকার বর্তমান পলিসি উদীয়মান বাজারগুলোর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। এই ক্ষতি কাটানোর জন্য এদের হাতে সুদহার হ্রাসবর্ধন কিংবা পুঁজি নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। 'কেন্দ্রবিন্দুহীন' বিশ্বে যা হয়। অবশ্য ফেড সর্বদাই নিজেকে দায়মুক্ত রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। বেন বেরনাঙ্ক এবং জ্যানেট ইয়েলেন ক্রমাগত বলছে ফেডারেল রিজার্ভের দায়িত্ব আমেরিকার অর্থনীতি চাঙ্গা রাখা, উদীয়মান বাজারের দেখভাল তাদের কাজ না। ফেডের দৃষ্টিতে উদীয়মান বাজারগুলো হচ্ছে জায়ান্টদের মুদ্রাযুদ্ধের 'কোলাটেরাল ড্যামেজ' বা অনাকাঙ্ক্ষিত বলি। ভাব দেখে মনে হচ্ছে ফেড মাতাল ড্রাইভারের ন্যায়, যে পথচারীদের পিষে চলে যাচ্ছে। তারপর যুক্তি কাটছে পথচারীরা রাস্তায় কেন এলো?

উদাহরণত, ফেড সাউথ আফ্রিকাকে পরোক্ষভাবে বলে দিয়েছে, 'যদি তুমি মনে করো তোমার মুদ্রা খুব দুর্বল, দাম হারাচ্ছে, তাহলে সুদহার বাড়িয়ে দাও, মুদ্রার দাম বাড়বে'। ভালো। তা সুদের হার বাড়িয়ে যে মুদ্রা শক্তিশালী করবে, ইতিমধ্যেই ভয়াবহ হয়ে উঠা দেশের বেকার সমস্যার কি হবে? সুদহার বাড়ানোর ফলে তা আরও ঘনীভূত হবে। শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা নয়, গোটা বিশ্বের জন্যই এটি সমান সত্য। বিশ্ব অর্থনীতির ওপর আমেরিকান অর্থনীতির ভূমিকা ফেড রীতিমতো অবজ্ঞা করে যাচ্ছে।

এখনো পর্যন্ত ডলার বিশ্বের প্রভাবশালী রিজার্ভ কারেন্সি। উদীয়মান বাজারগুলো, ব্রিকস এবং অন্যদের অধিকাংশ রিজার্ভ ডলারে। ফলে ডলারের দর উঠানামার সাথে সাথে এসব দেশ দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। ফেডের ডলার ম্যানিপুলেশন তাদের ওপর প্রভাব ফেলে। ফলে জর্দান, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন এবং ভিয়েতনাম-সহ অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলারের অস্থিরতার কারণে স্বর্ণের দিকে ঝুঁকছে, স্বর্ণের মজুত বাড়াচ্ছে।

ফেডারেল রিজার্ভের সামনে এখন যে বিপদ অপেক্ষা করছে—এটি উদীয়মান বাজারগুলোতে ক্রাইসিস তৈরি করতে পারে। যেহেতু এসব বাজার এখনো ডলারের ওপর নির্ভরশীল, তারা তখন কোনো উপায় খুঁজে পাবে না। ফেড সুদহার হ্রাসবৃদ্ধি করে ডলার ম্যানিপুলেশনের অর্থ হচ্ছে বিশ্বের প্রত্যেকটা বাজারকে ম্যানিপুলেট করা।

২০ বছর ধরে আমরা বিশ্ব পুঁজিবাজারকে গ্লোবালাইজ করার, সীমানার প্রতিবন্ধকতা তুলে দিয়ে একটি একক বাজারে পরিণত করার কথা বলে আসছি। নয়তো যেকোনো একটা উদীয়মান বাজারে ব্যালান্স অব পেমেন্ট ডেফিশিট কিংবা রিজার্ভ ক্রাইসিস নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। তা গোটা বিশ্বের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে।

১৯৯৭-৯৮ সালে এটিই ঘটেছিল। পুরো পৃথিবীর পুঁজিবাজার পতনের দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিল। সংকটের সূচনা হয়েছিল থাইল্যান্ডে, তারপর আঘাত হানে ইন্দোনেশিয়ায়, দক্ষিণ কোরিয়া হয়ে ঢুকে পড়ে রাশিয়ার পেটের ভেতর! রাশিয়ার সংকট 'লং টার্ম ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের' (এলটিসিএম) পতন ডেকে আনে। এলটিসিএম ছিল বিশ্বের বৃহত্তম হেজ ফান্ডগুলোর একটি। আমি তখন এলটিসিএমে ছিলাম। একদম সামনের সিটে বসে বাস্তব পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল। বিশ্বের প্রত্যেকটা স্টক এবং বন্ড মার্কেট পতনের দ্বারপ্রান্তে চলে গিয়েছিল। তখন ফেড এবং আইএমএফ ১৪টা প্রাইভেট ব্যাংকের সহায়তায় ৩.৬ বিলিয়ন ডলার দিয়ে এলটিসিএমকে রক্ষা করার ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। দুই বছর পর, ২০০০ সালে এলটিসিএম বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়।

অনুরূপ পরিস্থিত যেকোনো সময় তৈরি হতে পারে।

নৈরাজ্য ও পতন

বিনিয়োগকারী এবং সচেতন নাগরিকমাত্রই জানেন যে আমাদের গ্লোবাল অর্থব্যবস্থায় বুজরুকি কাজকারবার চলছে। সারা বিশ্ব থেকে আমি মানুষের এমন আশঙ্কার কথা শুনেছি, কিন্তু ক্ষমতায় যারা আছে, ফেডে, ট্রেজারিতে, মার্কিন নীতিনির্ধারণীতে, তাদের এ ব্যাপারে হুঁশ আছে বলে মনে হচ্ছে না। এমনকি তারা সমস্যা স্বীকারই করতে চাচ্ছে না, সমাধান তো পরের কথা।

দিনদিন আমরা অর্থব্যবস্থার পতনের নিকটবর্তী হচ্ছি। আগামীকালই ঘটবে না, তবে আজ হোক, কাল হোক, ঘটবেই। এটি ১০ বছর মেয়াদি পূর্বাভাস নয়। পাঁচ বছর পর হতে পারে? হয়তো। এক বছর? অসম্ভব না। দিন-তারিখ ধরে সুনির্দিষ্ট সময় বলা যাচ্ছে না, কিন্তু এটি মধ্যমেয়াদে ঘটার সম্ভাবনা প্রচুর এবং কাজ শুরু করার এখনই সময়।

এমন নয় যে অর্থব্যবস্থার পতন ঘটল, আর রাতারাতি আপনি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে চলে যাবেন। মাঝখানে বহু কাঠখড় পুড়াতে হবে, অনেক দুঃস্বপ্ন পাড়ি দিতে হবে। মনে রাখতে হবে বিগত শতকের সবচেয়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা—গ্রেট ডিপ্রেশনের কারণ ছিল ১৯২০-এর দশকে ভুল রেটে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে ফিরে যাওয়া। পূর্বেই দেখেছি কীভাবে ব্রিটেন-সহ অন্যান্য দেশ যুদ্ধপূর্ব রেটে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ডিফ্ল্যাশন বয়ে এনেছিল। পুনরায় গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড চালু করার আগে অতীত থেকে শিক্ষা নিতে হবে। স্বর্ণের মূল্য আউন্সপ্রতি ১০ হাজার ডলার থেকে ৫০ হাজার ডলারের মাঝামাঝি সেট করতে হবে। সেটা নির্ভর করবে মূলত স্বর্ণের মজুতের ওপর এবং কোন কোন দেশ এই ব্যবস্থায় অংশ নিচ্ছে তার ওপর।

যদি বর্তমান অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, নজিরবিহীন নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। কারণ বর্তমান অর্থব্যবস্থা অনেক বেশি জটিল। এখন থেকেই নিবেদিতপ্রাণ কোনো টিম কাজ শুরু করা প্রয়োজন, কিন্তু আমি এমন কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। অর্থনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক, সেন্ট্রাল ব্যাংক, অর্থমন্ত্রী, আইএমএফ কর্মকর্তা, রাষ্ট্রপ্রধান, জি টুয়েন্টি নেতৃবৃন্দ, সবাই মার্কেটের ভুল বোঝাপড়া নিয়ে পড়ে আছে, কোনো উদ্যোগ নেই। ফলে সামনে আমি নৈরাজ্য আর পতন ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বিনিয়োগকারীদের এখনই সচেতন হওয়ার সময়।

যখন বর্তমান অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, নীতিনির্ধারকদের প্রথম প্রতিক্রিয়া হবে অধ্যাদেশ জারি আর অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং। শুধু যে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেবে তা নয়, মিউচুয়াল ফান্ড, ইএফটি এবং অন্যান্য বিনিয়োগ পদ্ধতিও ফ্রিজ হয়ে যাবে। তারপর সম্ভবত গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড কিংবা সংশোধিত গোল্ড-ব্যাকড এসআরডি আসতে পারে। এ দুটিই আপাতত সবচেয়ে শক্তিশালী সম্ভাবনা বলে মনে হচ্ছে। তবে গোল্ড-ব্যাকড এসআরডি হবে বিশ্বের জন্য বেস্ট অপশন।

তবে এই অপশন বাস্তবায়নের দুটি পথ আছে—সুন্দর ও কদাকার। সুন্দর পথটা হচ্ছে এখন থেকেই সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে এক্সিকিউটিভ কমিটি, ওয়ার্কিং গ্রুপ করে কাজে লেগে যাওয়া। তথ্য সংগ্রহের জন্য টেকনিক্যাল স্টাডি শুরু করে দেওয়া। যা ইউরোজোন এখন গ্রিসের ক্ষেত্রে করছে। কদর্য পথটা হচ্ছে যেভাবে চলছে সেভাবেই উদাস চলতে থাকা। পতনের পর হুলস্থুল বাধিয়ে দেওয়া, গায়ের জোরে অধ্যাদেশ জারি করে করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা।

এ সময় বিনিয়োগকারীরা ক্ষতির সম্মুখীন হবেন নিশ্চিত। তাই জান বাঁচানোর জন্য ব্যাংকের বাইরে কিছু বাস্তব স্বর্ণ সংগ্রহে রাখুন, ব্যাংকেও কিছু টাকা রাখুন সচল পুঁজি হিসেবে। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। আমি দুটিই করছি। ব্যাংকের বাইরে আমার বাস্তব স্বর্ণের সংগ্রহ আছে, পাশাপাশি আছে বন্ড, শেয়ার, ডলার, সবই।

সম্ভাব্য বেইল ইন

যখন ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার কারণে ডিপোজিটররা তাদের সমুদয় অর্থ ফেরত পেতে ব্যর্থ হয়, কোনোভাবে অল্পকিছু ফেরত পায়—এই অবস্থাকে বলা হয় বেইল ইন। হতে পারে সেই ব্যাংকের কিছু অংশ ইনস্যুরেন্স করা আছে, সে ক্ষেত্রে এই অংশটা গ্রাহকরা ফেরত পায়। বাকি অংশটা হতে পারে ব্যাংকের সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে আনুপাতিক হারে গ্রাহকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হবে, হতে পারে কিছুই পাবে না। যখন ব্যাংকের হাতে যথেষ্ট পুঁজি থাকে না, তার দেনার পরিমাণ সমুদয় সম্পদ ও আয়ের চেয়ে বেড়ে যায়, তখন ব্যাংক দেউলিয়া

হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে ডিপোজিটর এবং ঋণদাতাদের চুল ছেঁড়া ছাড়া করার তেমন কিছু থাকে না।

অনেকেই এটি শুনে অবাক হন, অথচ ১৯৩৪ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বেইল ইন আইন বলবত আছে। ১৯৩৪-এর আগে ব্যাংক দেউলিয়া হলে ডিপোজিটর, ক্রেডিটর এবং বন্ডহোল্ডাররা কিছুই পেত না। পুরো টাকা গচ্চা। ১৯৩৪ সালে ফেডারেল ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স করপোরেশন (এফডিআইসি) গঠিত হয়। দফায় দফায় ইনস্যুরেন্সের সর্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখন এর পরিমাণ আড়াই লাখ ডলার। ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের জন্য অ্যামাউন্টটা যদিও বেশ বড়, হয়তো তাদের সমুদয় সম্পদ এই সীমার ভেতর এঁটে যাবে। কিন্তু বড় বড় বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি কিছুই না। তাদের একেক ব্যাংক অ্যাকাউন্টেই এরচেয়ে ঢের বেশি থাকে। আপনার যদি এক মিলিয়ন ডলার থাকে ব্যাংকে, ব্যাংক দেউলিয়া হলে শুধু সেই অংশটাই পাবেন, যেটা ইনস্যুরেন্স করা আছে। বেশিরভাগই লোকই মনে করে— টাকা তো ব্যাংকে রেখেছি, সম্পূর্ণ নিরাপদ।

বাংলাদেশে ২০০০ সালে ব্যাংক আমানত বিমা আইন করা হয়। আইনবলে ব্যাংকের অবসায়ন ঘটলে অর্থাৎ ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেলে যারা যারা ব্যাংকে টাকা রেখেছে, আনুপাতিক হারে তাদের পাওনা টাকা ফেরত পাবেন। বড়ই আশাপ্রদ বাণী। কিন্তু কথা হলো সেই টাকার পরিমাণ ১ লাখ টাকার বেশি হবে না! ব্যাংকে আপনার শতকোটি টাকা আমানত আছে নাকি হাজার-কোটি টাকা তা বিবেচ্য নয়, ১ লাখ তো পাচ্ছেন! তারপর বাকি টাকা শোধ করা হবে ব্যাংকের সম্পদ বিক্রি করে। যদি ব্যাংকের এতই সম্পদ থেকে থাকে, তবে দেউলিয়া হলো কেন?

২০২০ সালে আইন সংশোধন করে ব্যাংকের পাশাপাশি অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেও বিমার আওতায় আনা হয়। আইনের নাম পরিবর্তন করে 'আমানত সুরক্ষা আইন' নামকরণ করা হয়। ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবসায়ন হলে আমানতকারীরা ১ লাখ টাকা করে পাবেন ছয় মাসের ভেতর! বাকি টাকা নিয়ে টেনশন নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক মানুষকে 'গুজবে' বিভ্রান্ত হতে নিষেধ করেছে, এবং আশ্বাস দিয়েছে অবসায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বিক্রি করে তাদের টাকা 'পরিশোধ' করে দেওয়া হবে! বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য, ডকুমেন্টস, আইনের কপি এভেইলাবল।[১]

২০০৮ এবং পরবর্তী বছরগুলোতে বহু ব্যাংক দেউলিয়া হয়েছে। যদি সরকার হস্তক্ষেপ না করত, পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতো। ব্যাংক পতন থেকে মার্কেট পতন তৈরি হতে পারে, আবার মার্কেটের পতনও ব্যাংকের পতন ডেকে আনতে

---

[১] https://www.bb.org.bd/pub/annual/ditf/june2015ditf.pdf

১৯৩০-এরপর থেকে আমাদের ব্যাংকিং পারে। সম্পর্কটা একমুখী নয়, বহুমুখী। সিস্টেম কখনো এত অস্থিরতার শিকার হয়নি। আশির দশকের সংকটে বেশিরভাগ ডিপোজিটরদের অর্থ নিরাপদ ছিল, অল্প কিছু মার গিয়েছে।

ফলে দেখা যাচ্ছে দেউলিয়াত্ব এবং অবসায়ন মার্কিন ব্যাংকিং সেক্টরে নতুন কিছু নয়। নতুন হচ্ছে নীতিনির্ধারক এবং আমানতকারীদের সচেতনতা। সাইপ্রাস এবং গ্রিসে ২০১৩ ও ২০১৫ সালের সংকটের পর ইউরোপ-আমেরিকার নীতিনির্ধারকরা আমানতকারীদের আশ্বস্ত করেছে যে ভবিষ্যতে ব্যাংকিং সেক্টরে আতঙ্ক দেখা দিলে তারা ইনস্যুরেন্স অনুযায়ী বেইল ইন পাবে। এই আশ্বস্তকরণের অন্তর্নিহিত মর্ম হচ্ছে—ভবিষ্যতে ব্যাংক ধস দেখা দিলে আমানতকারীরা নীতিনির্ধারকদের দোষারোপ করতে পারবে না যে তারা আগে সতর্ক করেনি, তারা সতর্ক করে যাচ্ছে। আপনি ব্যাংকে টাকা রাখছেন কেন?

বাজেয়াপ্তকরণ এবং উয়িন্ডফল প্রফিট ট্যাক্স

উয়িন্ডফল প্রফিট ট্যাক্স হচ্ছে এমন কোনো সেক্টর, যারা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে লাভবান হয়েছে, তাদের ওপর অতিরিক্ত করারোপ। এর উদ্দেশ্য হলো সমাজের এক স্তর থেকে লভ্যাংশ নিয়ে বৃহত্তর সমাজে সম্পদের পুনর্বণ্টন নিশ্চিত করা। ভবিষ্যতে যদি বড়সড় কোনো অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় তবে সরকারের হাতে দুটি অস্ত্র থাকবে। এক হচ্ছে স্বর্ণ বাজেয়াপ্তকরণ, দ্বিতীয়ত উয়িন্ডফল প্রফিট ট্যাক্স। মার্কিন নাগরিক নয় এমন লোকদের ক্ষেত্রে এই আইনের ক্ষমতা যদিও সীমিত, কিন্তু মার্কিন ভূমিতে বা মার্কিন ব্যাংকে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে প্রায় ৬ হাজার টন স্বর্ণ মজুত আছে। খুব অল্প পরিমাণই সরকারের, বেশিরভাগই বিভিন্ন রাষ্ট্র ও আইএমএফের। আরও ৩ হাজার টন আছে জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরের সন্নিকটে, দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়ানো ছিটানো আরও স্বর্ণ আছে। সরকার চাইলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সবগুলো বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

সে ক্ষেত্রে সরকার সমুদয় স্বর্ণ নিজ মালিকানায় নিয়ে, মূল মালিকদের একটি করে কাগজ ধরিয়ে দেবে। সেখানে হয়তো লেখা থাকবে পরিস্থিতির উন্নতি হলে ভবিষ্যৎ অর্থব্যবস্থায়, 'ভবিষ্যৎ-আইন অনুযায়ী' তারা তাদের সম্পদ ফেরত নিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে ফেডারেল রিজার্ভে সংরক্ষিত স্বর্ণ যত সহজে বাজেয়াপ্ত করতে পারবে, ব্যক্তি-মালিকানায় ব্যাংকের বাইরে থাকা স্বর্ণ অত সহজে পারবে না।

১৯৩৩ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জনগণের হাতে থাকা স্বর্ণও বাজেয়াপ্ত করেছিল। গ্রেট ডিপ্রেশন শুরু হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক

বছর ছিল ১৯৩২। বেকারত্বের হার ২০%-এর ওপর চলে গিয়েছিল। সে বছর নভেম্বরে ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট হার্বার্ট হুবারের স্থলাভিষিক্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ সালের মার্চে তার শপথ গ্রহণের পূর্বে, মাঝখানের চার মাসে মার্কিন অর্থনীতির অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে যায়। বহু ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়, বহু ব্যাংক বন্ধ হয়। মিলিয়ন মিলিয়ন আমেরিকান ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিয়ে বালিশের তলায় কিংবা খাটের তলায় সযতনে রেখে দেয়। বাকি যারা 'যথাসময়ে' পদক্ষেপ নিতে পারেনি, তাদের সারা জীবনের সঞ্চয় গচ্চা।

মার্চের ছয় তারিখ রুজভেল্ট বিশেষ ক্ষমতাবলে আমেরিকার সব ব্যাংক দুই দিনের জন্য বন্ধ করে দেন। পরে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য বৃদ্ধি করা হয়। যদিও ১৩ তারিখ সীমিত কিছু ব্যাংক পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছিল। ব্যাংক সমস্যার আপাত সমাধান হলেও স্বর্ণ বেশ ভোগাচ্ছিল।

ফেডের পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টরে প্রচুর স্বর্ণ ছিল। কয়েন, বার, ও অন্যান্য স্বর্ণ ভল্টের বক্সবন্দি হয়ে পড়েছিল। অর্থনীতিতে সার্কুলেটেড হচ্ছিল না। স্বর্ণ অর্থ হওয়ার সত্ত্বেও অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারছিল না। স্বর্ণের বিপরীতে ডলারের দাম কমানোর সবচেয়ে সহজ পন্থা ছিল জাস্ট ঘোষণা দিয়ে দেওয়া যে আজ থেকে প্রতিআউন্স স্বর্ণের মূল্য ২০.৬৭ ডলারের পরিবর্তে ৩০ বা ৩৫ ডলার। কিন্তু এই ঘোষণার সমস্যা হচ্ছে এতে করে সরকার যত না লাভবান হবে, তার চেয়ে বেশি লাভবান হবে প্রাইভেট স্বর্ণধারীরা।

মূল্যবৃদ্ধির বেশিরভাগ টাকা চলে যাবে তাদের পকেটে, অর্থনীতিতে সার্কুলেশন হবে না। ফলে সরকার সব স্বর্ণ নিজ হাতে নিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৩৩ সালের ৫ এপ্রিল সরকারি আদেশ জারি করা হয়। 'আমি, ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট, ঘোষণা করছি যে জাতীয় সংকট এখনো চলমান...' এই আদেশে পহেলা মে, ১৯৩৩-এর পূর্বে ব্যক্তি, যৌথ, অ্যাসোসিয়েশন ও করপোরেশনের হাতে থাকা সমুদয় স্বর্ণ ফেডারেল রিজার্ভে জমা দিতে বলা হয়। আদেশ লঙ্ঘন করলে অনূর্ধ্ব ১০ হাজার ডলার জরিমানা বা অনূর্ধ্ব ১০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। মাত্র!

জনগণ সব স্বর্ণ সরকারের হাতে তুলে দেয়, বিনিময়ে আউন্সপ্রতি ২০.৬৭ ডলার করে পায়। গহণা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজে ব্যবহারের জন্য কিছু স্বর্ণ রাখার অনুমতি প্রদান করা হয়। সাধারণ জনগণ সর্বোচ্চ ১০০ ডলার সমপরিমাণ স্বর্ণ রাখার অনুমতি পায়।[1]

[1] James Rickards, *Currency wars : the making of the next global crisis*, New Yourk, Penguin, 2011, p. 79

কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি আর এখনকার পরিস্থিতি ভিন্ন। সে সময় সরকারের ওপর জনগণের প্রভূত আস্থা ছিল। অনেক মার্কিনীদের মনোভাব ছিল; যদি সরকার বলে তাদের হাতে থাকা স্বর্ণ সরকারের হাতে তুলে দিতে, তারা নির্দ্বিধায় তুলে দেবে। কিন্তু এখন সরকারের প্রতি সেই আস্থা নেই, এটা সরকারও বোঝে। তাই হয়তো ব্যক্তি-মালিকানাধীন স্বর্ণে হাত দেবে না সরকার।

পরিবর্তে সরকার উয়িন্ডফল প্রফিট ট্যাক্স আরোপ করতে পারে। স্বর্ণ লেনদেনের যাবতীয় তথ্য চাইবে, সেগুলোর ওপর উচ্চহারে করারোপ করবে। তবে উয়িন্ডফল প্রফিট ট্যাক্স আরোপ একটু কষ্টকর। এক্সিকিউটিভ আদেশবলে এটি আরোপ করা যাবে না। কারণ ট্যাক্স কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে। সেখান থেকে আইন পাশ করাতে হবে। এবং অল্প কজন সিনেটর চাইলেও সেই আইন ঠেকিয়ে দিতে পারে।

তবে শেষ কথা হচ্ছে চরম অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশ্ব-সরকারগুলো 'যা খুশি তাই' করতে সক্ষম। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরাও এ ক্ষেত্রে সরকারি 'আমলাদের' মতো কথা বলেন। সরকারি আমলাদের প্রধান লক্ষ্য সরকারের ক্ষমতা নিষ্কণ্টক করা, জনগণের সম্পদরক্ষা গৌণ। পক্ষান্তরে অর্থনীতিবিদদের প্রথম চিন্তা হওয়ার কথা কীভাবে মানুষের সম্পদের সুরক্ষা দেওয়া যায়। এর কারণ হচ্ছে 'গবেষকরা' সেসব বুলিই আওড়ান যেগুলো বিজনেস স্কুল আর অর্থনীতির ক্লাসে তাদের মগজে 'পুশ' হয়েছে।

ক্যাশ ওয়ার

কারেন্সি ওয়ার, ফিনান্সিয়াল ওয়ারের পাশাপাশি এখন আরও একটি যুদ্ধ চলমান—ক্যাশ ওয়ার। নগদ অর্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। দিনদিন ডিজিটাল অর্থের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুদ্রাযুদ্ধের এই নতুন মাত্রা স্বর্ণকে অধিকতর প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। আপনার হাতে কিছু নগদ টাকা রাখার অনেক যুক্তি আছে। বিশেষত আমার মতো যারা উপকূলীয় অঞ্চলে থাকেন, যেখানে প্রায়ই হারিকেন ঝড় আঘাত হানে। টানা কয়েক দিন বিদ্যুৎ থাকে না। এটিএম মেশিন, ক্রেডিট কার্ড রিডার কাজ করে না। ফলে এসব পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য আপনার হাতে কিছু নগদ টাকা থাকা চাই।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে ডিজিটাল মুদ্রার ব্যবহার বৃদ্ধি এবং তথাকথিত 'ক্যাশলেস' সোসাইটির গতি তীব্রতর হচ্ছে। আপনি হয়তো বলবেন—তো? এতে সমস্যা কই? ডিজিটাল মুদ্রা আমাদের জীবনকে সহজ করছে। হ্যাঁ, আমি আপনার সাথে একমত যে ডিজিটাল মুদ্রার অনেক ভালো দিক আছে। এবং সে কারণেই আমিও অন্যদের মতো ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, পেপাল-সহ আরও অনেক ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার করি। কিন্তু সম্পূর্ণ ডিজিটাল সিস্টেম অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব

ফেলবে। সরকার আপনাকে অর্থব্যয় করতে বাধ্য করবে। ব্যাংক আপনাকে ইন্টারেস্ট দেওয়ার পরিবর্তে আপনার থেকে উলটো চার্জ কেটে নেবে। মাস শেষে যা উদ্‌বৃত্ত থাকবে তা হয়তো মোবাইলের থেকে যাওয়া ডাটার মতো কেটে নেওয়া হবে। 'নেগেটিভ ইন্টারেস্টের' ছদ্মাবরণে এসব করা হবে। এসব মোকাবিলায় সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হচ্ছে নগদ অর্থ ব্যবহার করা। যাদের হাতে নগদ অর্থ থাকবে, নির্দিষ্ট সময় পর ডিজিটাল মুদ্রার মতো তাদের অর্থ কেটে নেওয়া হবে না।

সবাইকে ডিজিটাল অর্থ ব্যবহারে বাধ্য করা, সম্পূর্ণ ডিজিটাল সিস্টেমে ঢুকিয়ে দেওয়াটা হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টারেস্ট রেটের প্রথম ধাপ। ল্যারি সামার্স, কেনেথ রগলফের মতো ঘাগু অর্থনীতিবিদরা এর পক্ষে সাফাই গাইছে।

আধুনিক অর্থনীতিতে নেগেটিভ ইন্টারেস্ট রেট একটি নতুন ধারণা। যদিও সনাতন অর্থনীতি নেগেটিভ ইন্টারেস্ট ভিত্তিকই ছিল। ২০০৯ সালে সুইডেন প্রথম নেগেটিভ ইন্টারেস্ট রেট চালু করেছে। ব্যাংক একটি দ্বিমুখী প্রতিষ্ঠান। যাদের হাতে অতিরিক্ত অর্থ থাকে, তারা ব্যাংকে জমা রাখে। ব্যাংক তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ প্রদান করে। যেমন আমার হাতে অতিরিক্ত ১০০ টাকা আছে, আমি তা ব্যাংকে রেখে দিলাম। ব্যাংক বছর শেষে যদি ১০% মুনাফা দেয়; তবে আমার মোট টাকা হবে ১১০ টাকা। কিন্তু কথা হচ্ছে অতিরিক্ত ১০ টাকা ব্যাংক পাবে কোথায়? আমি যে টাকাটা ব্যাংকে রেখেছি, তা ব্যাংক নিজের হাতে রেখে দেবে না। সে আরেকজনকে ধার দেবে। যেমন আমার হয়তো অতিরিক্ত টাকা আছে, কিন্তু আরেকজন দেখা যাবে একটা কোম্পানি করবে, তার পর্যাপ্ত টাকা নেই, সে ব্যাংক থেকে টাকা ধার নেবে। আমার রাখা টাকাটা। বিনিময়ে ব্যাংককে সে একটা লাভ দিতে হবে। হতে পারে সেটা ১২%। তাহলে বছর শেষে ব্যাংক সেই লোক থেকে ১১২ টাকা আদায় করবে, আমাকে দেবে ১১০ টাকা, ২ টাকা ব্যাংকের লাভ। আমি হলাম আমানতকারী, সঞ্চয়কারী বা ডিপোজিটর, সেই লোক ঋণগ্রহীতা।

যখন ব্যাংকিংব্যবস্থা শুরু হয় তখন যাদের হাতে অতিরিক্ত টাকা থাকত তারা নিজেদের টাকা নিরাপদ রাখার জন্য ব্যাংকে রাখত। ফলে এটি খুব স্বাভাবিক যে ব্যাংক তাদেরকে কোনো লাভ তো দেবেই না, উলটো তার টাকা নিরাপদ রাখার জন্য একটা ফি নেবে। যেমন বর্তমানে ব্যাংকের ভল্টে যদি আপনি কিছু রাখেন, কোনো মুনাফা পাবেন না। উলটো বছর বছর আপনাকে ভল্টের ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। সঞ্চয়কারীদেরকে ব্যাংক কোনো মুনাফা না দিয়ে উলটো তাদের থেকে চার্জ কেটে নেওয়াই নেগেটিভ ইন্টারেস্ট রেট। অর্থাৎ আমি যদি ব্যাংকে ১০০ টাকা রাখি, বছর শেষে আমি ব্যাংককে চার্জ বাবদ হয়তো এক টাকা পরিশোধ করতে হবে, ফলে আমার টাকা হবে ৯৯ টাকা।

কথা হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টারেস্ট রেট কেন? ধারণা করা হয় এর ফলে মানুষ ব্যাংকে টাকা রাখতে অনুৎসাহিত হবে, বেশি বেশি খরচ করতে আগ্রহী হবে। এতে অর্থনীতি গতিশীল হবে। যেমন সরকার যদি নিয়ম করে মাস শেষে আমার কার্ডে যত টাকা থাকবে, তার ১% কেটে নেবে। আমি কী করব? আমি সব টাকা খরচ করে ফেলতে চেষ্টা করব, যেন কাটার মতো কিছু না থাকে। উন্নত বিশ্বের দেশগুলো এখন নেগেটিভ ইন্টারেস্টের দিকে ঝুঁকছে।

বাহ্যত ডিজিটাল মুদ্রার পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে সরকারের ভাষ্য হচ্ছে—আমরা নগদ টাকার বিপক্ষে নই। আমরা শুধু মাদক ব্যবসায়ী, করখেলাপি, সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন রোধ করতে চাচ্ছি। এই কারণে আমরা জনগণের হাতে নগদ টাকা রাখার অনুমতি দিই না। এই যুক্তির অর্থ কী জানেন? খুব ইন্টারেস্টিং! এর অর্থ হচ্ছে আপনি যদি আপনার হাতে নগদ টাকা রাখতে চান; তবে আপনি যতই আইন মেনে চলুন না কেন, আপনি সম্ভাব্য মাদক ব্যবসায়ী, কর ফাঁকিবাজ এবং সন্ত্রাসী।

নগদ অর্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্য শুধু নেগেটিভ ইন্টারেস্ট মেরে খাওয়াই নয়; বরং নগদ অর্থ না থাকলে বেইল ইন, বাজেয়াপ্তকরণ এবং অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া সহজ হয়ে যাবে। চাইলেই সঞ্চয়কারীদের অর্থ আটকে দেওয়া যাবে। জনগণকে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বড় বড় ব্যাংকের খোয়াড়ে ঢোকানো যাবে। কারণ সরকার ডিজিটাল মুদ্রার অনুমতি হয়তো শুধু তাদেরকেই দেবে।

নগদ অর্থের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধ আমাদেরকে ১৯০০ থেকে ১৯১৪ সাল নাগাদ স্বর্ণ-রুপার ভাগ্যে কী ঘটেছে তা বুঝতে সহায়তা করবে। সালটা যদি হয় ১৯০১, আপনি দোকান থেকে কিছু কিনে পকেট থেকে চকচকে স্বর্ণ বা রুপার মুদ্রা বের করতেন। আমি যখন ছোট ছিলাম তখনো চার আনা, আট আনার আধুলিগুলো রুপার ছিল। ১৯৬০ সালের পর সরকার রুপার মুদ্রার পরিবর্তে তামা, জিঙ্ক আর অন্যান্য ধাতবমিশ্রিত মুদ্রার প্রচলন করে।

সরকার কীভাবে জনগণের পকেট থেকে স্বর্ণ-রুপার কয়েন কেড়ে নিলো? ব্যাংকগুলো ধীরে ধীরে স্বর্ণ-রুপার কয়েনগুলো বাজার থেকে তুলে নিয়েছে, সেগুলো গলিয়ে হয়তো ৪০০ আউন্স স্বর্ণের বারে পরিণত করেছে। তারপর আপনাকে বলেছে—'দেখো, আমরা কিন্তু স্বর্ণ-রুপার বিরুদ্ধে নই। তুমি চাইলে এখনো স্বর্ণ-রুপা কিনতে পারো, কিন্তু ৪০০ আউন্স ওজনের কয়েন পকেটে নিয়ে ঘুরা চাট্টিখানি কথা নয়'। তখন মানুষ বুঝতেই পারেনি তাদের হাত থেকে স্বর্ণ-রুপা উধাও হয়ে গিয়ে গুটিকয়েক ব্যাংকের ভল্টে জমা হবে। এখনকার মতো তখনো তাদের নিকট স্বর্ণ-রুপার চেয়ে কাগুজে টাকা বেশি সুবিধাজনক মনে হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে যখন স্বর্ণ বেআইনি ঘোষণা করা হয়, বাস্তবে তখন মানুষের হাতে তেমন স্বর্ণ ছিলই না। এখন সব স্বর্ণ ব্যাংকের ভল্টে, যা একটিমাত্র

প্রশাসনিক আদেশেই বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া সম্ভব। জনগণের পকেটে থাকলে এত সহজ ছিল না ব্যাপারটা। ফলে বলা চলে—স্বর্ণের ওপর সরকারের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্যই ধীরে ধীরে মানুষকে স্বর্ণবিমুখ করা হয়েছে।

এখন হুবহু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। মানুষ কাগুজে টাকার পরিবর্তে ডিজিটাল মুদ্রা গ্রহণ করছে। এটি অধিকতর সহজ বলে। যখন কাগুজে মুদ্রা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তখন সরকার নানা ছুঁতোয় ডিজিটাল মুদ্রা মেরে খাওয়া শুরু করবে। মানুষ তখন বুঝবে, কিন্তু ততদিনে বড্ড দেরি হয়ে যাবে যে! স্বর্ণ-রুপার কয়েন থেকে স্বর্ণভিত্তিক ডলার হয়ে, বিহিত মুদ্রার পর ডিজিটাল মুদ্রায় আসতে গোটা ১০০ বছর লেগেছে। এবং বিস্ময়কর হচ্ছে প্রতিটি ধাপে মানুষের সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ পূর্বের ধাপের চেয়ে সহজ হয়েছে।

২০ শতকের সূচনালগ্নে আমরা স্বর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দেখেছি, তখন বলা হয়েছে কাগুজে মুদ্রা ভালো। এখন একুশ শতকে এসে কাগুজে মুদ্রার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ দেখছি। মজার বিষয় হলো নগদ অর্থের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে জয়ী হওয়ার হাতিয়ার হচ্ছে স্বর্ণে ফিরে যাওয়া। কারণ এখন স্বর্ণ বৈধ, যদিও তখন অবৈধ ছিল! ১৯৩৩ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত আমেরিকাতে স্বর্ণের মালিকানা-লাভ আইনত অবৈধ ছিল। পৃথিবীর বহু দেশে এখনো অবৈধ।

এখন আপনার উচিত হলো স্বর্ণের পাশাপাশি নগদ অর্থ হাতে রাখা। এখনো এটি অবৈধ হয়নি, তবে আপনি যদি ব্যাংকে গিয়ে নগদ ৫ হাজার ক্যাশ চান, আপনাকে আইডি শো করতে হবে, ফরমে স্বাক্ষর করতে হবে, প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, উপরন্তু সরকারের নিকট রিপোর্ট যাবে ৫ হাজার ডলার ক্যাশ চাওয়ার 'অপরাধে'! ১০ হাজার চাইলে তো কারেন্সি ট্রানজেকশন রিপোর্ট দেখাতে হবে। ক্যাশ চাইলে আপনি যদিও চোর না, মাদক ব্যবসায়ী না, কিন্তু ব্যাংক আপনার সাথে চোরের মতো আচরণ করবে। বাহ্যত মনে হচ্ছে নগদ অর্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সরকার ইতিমধ্যেই জয়ী। তাই স্বর্ণের ওপর নজর দেওয়া প্রয়োজন।

প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সংবাদপত্রে নিশ্চয় দেখে থাকবেন বিমানবন্দরে স্বর্ণ আটক, বিমানের টয়লেটে স্বর্ণ। আবার ২০১৭ সালে আপন জুয়েলার্সের মালিকের ছেলের নামে ধর্ষণ মামলা হওয়ার পর বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী আপন জুয়েলার্স থেকে স্বর্ণ আটক করে প্রায় ১৫ মণ! জুয়েলার্স কর্তৃপক্ষ যার কোনোটারই বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। দেশের বৃহত্তম জুয়েলার্সের স্বর্ণের কেন বৈধ কাগজ নেই? বিমানের কমোডে করে কেন স্বর্ণ আসে? কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে বৈধভাবে অপরিশোধিত স্বর্ণ আমদানি বেআইনি এবং পরিশোধিত স্বর্ণ আনতে গেলে গুণতে

হবে বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স। দেশে প্রতিবছর স্বর্ণের চাহিদা ২০ থেকে ৪০ টন। প্রায় ৩৬ টন স্বর্ণ সংগ্রহ করা হতো অবৈধভাবে। বিদেশফেরত একজন যাত্রী ২০০ গ্রাম স্বর্ণালংকার আনতে পারতেন, ১০০ গ্রাম করমুক্ত, বাকি ১০০ গ্রামের জন্য কর দিতে হতো। আপন জুয়েলার্সকাণ্ডের পর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ স্বর্ণের বাজারের বুজরুকি নিয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করে। তারপর সরকার নড়েচড়ে বসে। স্বর্ণ আমদানি আইন সংশোধন করা হয় ২০১৮ সালে। সে বছর নভেম্বরে স্বর্ণ নীতিমালা ২০১৮ পাশ হয়। ২০২১ সালে সংশোধিত আইন পাশ হয়।[১] *প্রথম আলোর* তথ্যমতে ২০২০ সালের জুলাইতে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বৈধভাবে দেশে ১১ কেজি স্বর্ণ আমদানি করা হয়।[২] পাশাপাশি ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তোলার কার্যক্রমও তীব্রতর। প্রতিনিয়ত আমরা এর ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। মানুষকে নগদ অর্থের পরিবর্তে ডিজিটাল মুদ্রায় অভ্যস্ত করতে কত রকম বাহারি নাম, ধাম আর অফারের ছড়াছড়ি!

উপসংহার

একুশ শতকের একজন বিনিয়োগকারী হিসেবে আমি আমার সব সম্পদ ডিজিটাল করে ফেলতে আগ্রহী না। আমি চাই আমার সম্পদের একাংশ হোক বাস্তব সম্পদ—স্বর্ণের মতো। আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার অস্থিরতা, কারেন্সি ওয়ার, সাইবারফিন্যান্সিয়াল ওয়ার এবং ওয়ার অন ক্যাশের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আমার পূর্বাভাস হচ্ছে—অদূর ভবিষ্যতে স্বর্ণের দাম আরও বৃদ্ধি পাবে। এই পূর্বাভাসের পক্ষে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এখনো অপরিবর্তনীয় রয়েছে।

* * *

---

[১] https://fliplink.io/ps84c
[২] https://fliplink.io/WR0Og

নবম অধ্যায়

স্বর্ণসঞ্চয় পদ্ধতি

স্বর্ণের বাজার

বন্ড ও অন্যান্য পণ্যের তুলনায় স্বর্ণের বাজার বেশ অদ্ভুত। প্রথমত, স্বর্ণ লিকুইড বা তরল। অর্থাৎ যেকোনো সময় বিক্রিযোগ্য। দ্বিতীয়ত, স্বর্ণের বাজার হচ্ছে 'থিন মার্কেট' বা স্বর্ণের সম্পূর্ণ মজুদের তুলনায় লেনদেনযোগ্য স্বর্ণের হার অতি নগণ্য। এখানে অদ্ভুত হচ্ছে—থিন মার্কেট সাধারণত অত তরল হয় না। আমি কখনো এমন দেখিনি যে-কেউ স্বর্ণ বিক্রি করতে চাচ্ছে কিন্তু ক্রেতা নেই, অথবা কিনতে চাচ্ছে, বিক্রেতা নেই। স্বর্ণের বাজার থিন হওয়ার আরেকটা বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে যাদের হাতে স্বর্ণ আছে, চাই সেটা সেন্ট্রাল ব্যাংক হোক বা উপমহাদেশি ব্যাংক, কেউই তা ছাড়তে চায় না। তারা এগুলো দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ করে। বেচাকেনা যা হয় বেশিরভাগই কাগুজে।

তবে স্বর্ণের বাইং প্যানিক বা ক্রয়াতঙ্ক তৈরি হলে 'থিন মার্কেট' পুরোপুরি শুকিয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে স্বর্ণ তারল্য হারাবে। ছোটবেলায় অর্থনীতিতে আমরা পড়ে এসেছি যে কেনার চাহিদা বাড়লে বিক্রেতারা বিক্রি করতে আগ্রহী হয়। স্বর্ণের বাজার বিপরীত। এখানে কেনার হিড়িক পড়লে, বাস্তব স্বর্ণের যৎসামান্য যা বিক্রেতা আছে, তারাও বিক্রি বন্ধ করে দেবে। কারণ স্বর্ণ কেনার হিড়িকের অর্থ হচ্ছে টাকার ওপর আস্থা কমে যাওয়া বা হারিয়ে ফেলা। ফলে মূল্যবৃদ্ধি মূলত টাকাকে অধিককতর কাঙ্ক্ষিত করার বদলে 'অনাকাঙ্ক্ষিত' বস্তুতে পরিণত করবে। যাদের হাতে স্বর্ণের বৃহৎ মজুত তারা তখন কোনোভাবেই তা হাতছাড়া করতে রাজি হবে না যতক্ষণ না সরকার হস্তক্ষেপ করছে বা নতুন দাম নির্ধারণের মাধ্যমে ক্রয়াতঙ্ক বন্ধ হচ্ছে।

কথা হচ্ছে ক্রয়াতঙ্ক শুরু হবে কেন?

অনেক কারণে শুরু হতে পারে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে বন্ড ও অন্যান্য বিনিয়োগপণ্যের দাম কমে যাওয়া। ফলে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতি কমানোর জন্য স্বর্ণের দিকে ঝুঁকবে। ২০১৫ সালে চিনে আমরা এর নজির দেখেছি। চীনা-নীতির ফলে সে দেশের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য দেশের বাইরে বিনিয়োগ করা

কষ্টকর। ফলে যখন স্টকমার্কেট এবং রিয়েল এস্টেটের দাম পড়তে শুরু করেছে, এবং তা পূরণের জন্য সরকার সুদহার যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করছে না, চীনারা স্বর্ণের দিকে ঝুঁকেছে।

সম্প্রতি হংকং-এ আমি বিশ্বের বড় বড় ব্যাংক এবং স্বর্ণব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে শীর্ষস্থানীয় একজনের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। সে স্বীকার করেছে যে চীনে স্বর্ণের চাহিদা বাড়বে, যা ক্রয়াতঙ্ক তৈরি করতে পারে।

দ্বিতীয় কারণ হতে পারে বড় ক্লায়েন্টদের কারও কেনা স্বর্ণ ডেলিভারি দিতে ব্যর্থ হলে। যদি বিক্রেতা চুক্তি অনুযায়ী বড় ডিলারদের স্বর্ণ সরবরাহে ব্যর্থ হয় আর এই সংবাদ 'ফুটো' হয়ে যায়, যা সবসময়ই হয়ে থাকে, তাহলেও ক্রয়াতঙ্ক তৈরি হতে পারে। কারণ এতে যাদের হাতে বিপুল পরিমাণ 'কাগুজে স্বর্ণ' আছে, কাগজের ওপর তাদের আস্থা কমে যাবে, ফলে কাগুজে স্বর্ণকে তারা বাস্তব স্বর্ণে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করবে। যা আরও বেশি ডেলিভারি ব্যর্থতা তৈরি করবে, কারণ সবার চাহিদা মেটানোর মতো এত স্বর্ণ মজুত নেই। বিক্রেতারা স্বর্ণের বদলে টাকা অফার করতে পারে। ফলাফল? অধিকতর আতঙ্ক।

সংরক্ষণ

স্বর্ণ কোথায় সংরক্ষণ করব? এই প্রশ্নের জবাব নির্ভর করছে আপনি কী পরিমাণ স্বর্ণের কথা বলছেন তার ওপর। যদি এটি হয় এক আউন্স ওজনের কয়েন তাহলে যেখানে খুশি রাখতে পারেন। কিন্তু সেটা যদি হয় ১০০ মিলিয়ন মূল্যের স্বর্ণের বার তবে থার্ড পার্টি ভল্টই সবচেয়ে নিরাপদ।

থার্ড পার্টি ভল্টের ক্ষেত্রে আমি আমার ক্লায়েন্টদের পরামর্শ দিয়ে থাকি ব্যাংকের ভল্টে না রাখতে, প্রাইভেট ভল্টে রাখতে উৎসাহিত করি। কারণ ব্যাংকের ওপর সরকারে নিয়ন্ত্রণ বেশি, ফলে অর্থনৈতিক ক্রাইসিসে সহজেই সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে দিতে পারে। প্রাইভেট ভল্ট হলে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্রিঙ্কস, লুমিস এবং ডানবারের মতো প্রসিদ্ধ ও পুরাতন কোম্পানি হতে হবে।

নিজে সংরক্ষণের ঝামেলা পোহাতে না চাইলে দ্বিতীয় আরেকটি পদ্ধতি হতে পারে গোল্ড ফান্ডে বিনিয়োগ করা, যারা তাৎক্ষণিক ক্যাশ বা গোল্ড প্রদানে সক্ষম, নিরাপদ এবং প্রসিদ্ধ। আমি ইএফটি বা আন-অ্যালোকেটেড (বণ্টন অযোগ্য) স্বর্ণের কাগুজে কেনাবেচার কথা বলছি না। আমি বলছি এমন ফান্ডের কথা যারা বাস্তব স্বর্ণ সংগ্রহ করে এবং তা সম্পূর্ণ বণ্টনযোগ্য। এ ক্ষেত্রে 'ফিজিক্যাল গোল্ড ফান্ড' এবং স্প্রট প্রসিদ্ধ কোম্পানি।

এ ক্ষেত্রে অনেকে দেশ ও আইনের বিষয়টা বিবেচনায় আনে। তাদের মতে সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও দুবাইর মতো যেসব দেশে আইনি সুরক্ষা শক্তিশালী, যুক্তরাষ্ট্রে রাখার চেয়ে সেখানে রাখা ভালো। কারণ সংকটকালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার স্বর্ণ বাজেয়াপ্ত করার সম্ভাবনা বেশি এবং অতীতে তার এই রেকর্ডও আছে। কিন্তু আমি তাদের মতের সাথে একমত নই। কারণ আমরা প্ল্যান করছি সংকটকালের জন্য। হয়তো সে সময় দাঙ্গা চলতে পারে, সামাজিক অস্থিরতা চলতে পারে। তো যোগাযোগব্যবস্থা ভেঙে পড়লে আপনি আপনার স্বর্ণ আনতে যাবেন কীভাবে?

আমার কিছু ফ্রেন্ড বলে—প্রাইভেট জেটে করে যাব! আচ্ছা, প্রাইভেট জেট তাহলে জ্বালানি ছাড়া চলে? দাঙ্গার সময় বিদ্যুৎ ও অন্যান সেবা অচল থাকাই স্বাভাবিক, আপনি জ্বালানি পাবেন কই? মূল বিষয় হচ্ছে ডিজাস্টার প্ল্যানিং বা আপদকালীন পরিকল্পনা একটা জটিল বিষয়। আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ হচ্ছে যাদের মজুত অনেক বেশি, তারা সুইজারল্যান্ড বা এরকম সহজগম্য কোনো দেশে একাংশ রাখবে, আরেকাংশ রাখবে নিজ দেশে, নিজের আশেপাশে। যাদের মজুত কম তারা নিজ দেশেই প্রাইভেট কোম্পানির ভল্টে রাখবে। দ্য স্টেট অব টেক্সাস ব্যাংকব্যবস্থার বাইরে একটি গুদাম তৈরি করতেছে। টেক্সাসের ওপর আস্থা রাখা যায়। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার স্বর্ণ বাজেয়াপ্ত করতে চাইলে টেক্সাস সংবিধানের দশম সংশোধনীবলে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে এবং স্টেটের সার্বভৌমত্ব ধরে রাখতে পারবে। এই অপশনটিও ভেবে দেখার মতো।

২০১৩ সালে আমি সুইজারল্যান্ডের জুরিখের সন্নিকটে বিভিন্ন ভল্ট পরিদর্শন করেছি। সাথে ছিল ফান্ডের অন্যান্য কলিগ এবং দুজন অডিটর। ভল্ট অপারেটররা আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেখিয়েছে। একটা স্বর্ণের প্যালেট এনে দেখিয়েছে। এর ভেতরে আমরা স্বর্ণের বার, সিরিয়াল নাম্বার, তারিখ, রিফাইনারির স্ট্যাম্প এবং ওজন ও বিশুদ্ধতার নোটিশ দেখেছি। সাথে থাকা অডিটররা লেজার দিয়ে তা চেক করে দেখেছে, সব ঠিক আছে। আমেরিকাতে এই ধরনের সুবিধা বিরল। ভল্ট অপারেটররা আমাকে বলেছে যে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকের ভল্ট থেকে প্রাইভেট ভল্টে স্বর্ণ স্থানান্তরের পরিমাণ বেড়েছে।

আমরা সুইজারল্যান্ডের শীর্ষস্থানীয় একটি রিফাইনারিও পরিদর্শন করেছি। তারাও একই কথা বলেছে। আরও বলেছে এখন তারা স্বর্ণ পরিশোধনে সম্পূর্ণ অটোমেটিক সিস্টেম ব্যবহার করে, ঘড়ির কাঁটা ধরে। কিন্তু চাহিদা মেটাতে পারছে না। এত বিপুল স্বর্ণ কই পায়—জিজ্ঞেস করেছিলাম। মূলত তিনটি উৎস থেকে তারা স্বর্ণ সংগ্রহ করে।

প্রথমত, খনি থেকে আসা ৮০ শতাংশ পরিশুদ্ধ আধা-স্বর্ণ। নেকলেস, ব্রেসলেট এবং ঘড়ি-সহ পুরাতন স্বর্ণালংকার। তৃতীয়ত, ছোট ছোট স্বর্ণের বার, যা গলিয়ে

বড় বারে পরিণত করা হয়। পাশাপাশি তারা স্বর্ণের মানোন্নয়নও করে থাকে। ৯৯.৫০% বিশুদ্ধ স্বর্ণকে ৯৯.৯৯ শতাংশ বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত করা হয়। এগুলো মূলত চীনাদের চাহিদা।

চীন নীরবে লন্ডন বুলিয়ন মার্কেট অ্যাসোসিয়েশনকে পেছনে ফেলতে চাচ্ছে। 'গুড ডেলিভারি' সিস্টেম গড়ে তুলছে। এ ক্ষেত্রে সাংহাই গোল্ড এক্সচেঞ্জ এবং সাংহাই ফিউচার এক্সচেঞ্জকে ব্যবহার করছে। যথাযথ ডেলিভারি কাকে বলে তা তারা দেখিয়ে দিচ্ছে। নিজেদের রিফাইনারি গড়ে তুলেছে, স্বর্ণের নিজস্ব মান গড়ে তুলেছে। ফলে দিনদিন লন্ডনকে পেছনে ফেলে সাংহাই বিশ্বের স্বর্ণ-বাজারের কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে।

স্টকমার্কেটের স্বর্ণ

এতক্ষণ আমরা বাস্তব স্বর্ণ এবং কাগুজে স্বর্ণ নিয়ে কথা বলেছি। কিন্তু স্টকমার্কেটেও স্বর্ণ বিক্রি হয়। এগুলো গোল্ড মাইনিং স্টক (স্বর্ণখনির শেয়ার) নামে পরিচিত। আমি সাধারণত বাস্তব স্বর্ণ এবং এগুলোর পেপার ডেরিভেটিভস (অর্থনীতিতে ডেরিভেটিভস বলা হয় এমন যেকোনো পণ্য যার মূল্য অন্য আরেকটা পণ্যের ওপর নির্ভরশীল, যেমন স্বর্ণের পেপার ডেরিভেটিভসের মূল্য অনেকাংশে বাস্তব স্বর্ণের ওপর নির্ভরশীল) নিয়েই কথা বলি। আমি স্টকমার্কেট বিশেষজ্ঞ নই। স্বর্ণভিত্তিক অর্থব্যবস্থাই আমার প্রধান ফোকাস।

তবে স্বর্ণের স্টকমার্কেট নিয়েও আমি প্রচুর গবেষণা করেছি, লেখালেখি করেছি এবং কথা বলেছি। গোল্ড মাইনিং স্টকগুলো মোটাদাগে বাস্তব স্বর্ণের দাম দ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে এগুলো বাস্তব স্বর্ণের চেয়ে অধিকতর অস্থিতিশীল। ফলে স্বর্ণের দাম বাড়লে, শেয়ারের দাম বাড়ে আরও বেশি। অনুরূপ স্বর্ণের দাম কমলে, শেয়ারের দাম বাস্তব স্বর্ণের চেয়েও বেশি পড়ে যায়। ফলে বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি আদর্শ জায়গা নয়। কাগুজে স্বর্ণ লেনদেন করতে চাইলে স্টকমার্কেট ছাড়াও ইএফটির মতো বহু উপায় আছে।

তবে অনেক ক্ষেত্রে গোল্ড মাইনিং স্টকগুলো স্বতন্ত্র পণ্যের মতো। যেমন প্রতিটা খনির আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে, তাদের স্বর্ণের আলাদা কোয়ালিটি আছে, ব্যবস্থাপনা, ফিনান্সিং-সহ প্রতিটি কোম্পানির আরও অনেক স্বাতন্ত্র্য থাকে। শেয়ারের মূল্যে সেগুলোর ওপরও নির্ভরশীল। তবে স্টকমার্কেটে বিনিয়োগ করেই অনেকে ভাবেন তারা স্বর্ণখনির বিনিয়োগকারী। বাস্তবে দুটির মাঝে বিস্তর ফারাক।

তা ছাড়া কিছু কোম্পানি আছে সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিসর। প্রাচীন। কিছু আছে নবীন ও অস্থিতিশীল। আর কিছু একদমই ভুয়া। একজন বিনিয়োগকারী কীভাবে বুঝবেন

কে আসল কে নকল? কোম্পানি ধরে ধরে গবেষণা করতে যা সময়সাপেক্ষ হওয়ার পাশাপাশি অনেক বিনিয়োগকারীর সাধ্যের বাইরে। তাদের জন্য সবচেয়ে সহজ পন্থা হলো স্বর্ণখনি নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের ফলো করা। এ ক্ষেত্রে জন হাদাওয়া (Jogn Hathaway), তার সহকর্মী এবং ডগ ক্যাসির (Doug Casey) নাম উল্লেখযোগ্য। তবে সবকিছুর শেষে আমার কথা একটাই—বাস্তব স্বর্ণ রাখুন হাতে। গোল্ড মাইনিং স্টকমার্কেটে বিনিয়োগ করতে চাইলে সুপ্রসিদ্ধ কোম্পানিতে করুন।

স্বর্ণ ও স্টকমার্কেটের আন্তঃসম্পর্ক

অনেক বিনিয়োগকারী স্বর্ণ ও স্বর্ণখনির শেয়ার—একটাকে আরেকটার বিকল্প ভেবে থাকেন। তাদের মত হচ্ছে যখন বাজার ভালো থাকবে, তখন শেয়ার কিনব। যখন অস্থিরতা দেখা দেবে, শেয়ার বিক্রি করে স্বর্ণ কিনব। অনেকে তো আমাকে এই অনুরোধও করেছেন যেন শেয়ারমার্কেট পতনের আগের দিন আমি তাদের জানাই! তারা শেয়ার বেচে প্রস্তুতি নিতে পারেন! হাস্যকর। কেউ জানে না কবে মার্কেটের পতন হবে। আজও হতে পারে। এক বছর পর হতে পারে, কয়েক বছর পরও হতে পারে। আপনি যদি প্রস্তুতি নিতেই চান তবে তার সময় হচ্ছে—আজকে, এখনই। আমি শুধু পূর্বাভাস দিতে পারি পতন কেমন হবে, ফলাফল কী হবে এবং কতটা ভয়াবহ হবে।

স্বর্ণ ও শেয়ারের মাঝে তারা যে আন্তঃসংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছেন তা সঠিক নয়। মুদ্রাস্ফীতির শুরুর দিকে স্বর্ণ এবং শেয়ার দুটির দামই বাড়তে পারে। সংকটকালে শেয়ারের মূল্যহ্রাস এবং স্বর্ণের মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে পারে। আবার ইতিবাচক ইন্টারেস্ট রেটের শক্তিশালী অর্থনীতিতে স্বর্ণের দাম পড়তে পারে, শেয়ারের দাম বাড়তে পারে। আবার কখনো দুটিই মূল্য হারাতে পারে। সহজ কথায়— স্বর্ণ ও শেয়ার দুটি দ্বিমুখী পণ্য। সময়ের সাথে সাথে এদের গতিপ্রকৃতি পালটায়।

উপসংহার

পুঁজিবাজারের সিস্টেমিক রিস্ক সম্পর্কে আমার মডেল ভয়াবহ দুর্বিপাকের দিকনির্দেশ করে। অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার পতনের ইঙ্গিত প্রদান করে। তবে এখনো আমরা অসহায় নই। চাইলে সম্পদের সুরক্ষায় মন দিতে পারি। ভবিষ্যতের প্রস্তুতি নিতে পারি।

সব অর্থনৈতিক সংকটেই কিছু কিছু বিনিয়োগকারী, কিছু পণ্য বিশেষ সুবিধাভোগ করে থাকে—বিশেষত স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। এসব বিশেষ সম্পদ সংকটকালে শুধু যে সুরক্ষা দেয় তা নয়; বরং অস্থিরতার মধ্যেও সমৃদ্ধি ও অধিকতর সম্পদ বয়ে আনতে পারে। ওয়ারেন বাফেট ও অন্যান্য বিনিয়োগকারীরা দশক দশক ধরে এই কৌশল অনুসরণ করে আসছে, এখন চীন করছে।

কমপ্লেক্সিটি থিয়োরির চশমা দিয়ে আমি রিস্ক পরিমাপ করি। এই থিয়োরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে 'স্কেল' বা মাত্রা। স্কেল হচ্ছে সিস্টেমের আকার—আয়তন, কার্যক্রমের নিবিড়তা (ডেনসিটি) এবং সাইজের তুলনায় সংযুক্তির মাত্রা। কমপ্লেক্স সিস্টেমে সবচেয়ে বাজে যে বিষয়টা ঘটতে পারে তা হল এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশান অব স্কেল। যার সহজ অর্থ হচ্ছে—আপনি সিস্টেমকে দ্বিগুণ করে ফেললে, রিস্কের মাত্রা দ্বিগুণের চেয়েও বেশি বৃদ্ধি পাবে। বহুগুণও বৃদ্ধি পেতে পারে।

২০০৮ সালের পর থেকে ব্যাংকগুলো আমাদের অর্থনীতির মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। নীতিনির্ধারকরা কাকের ন্যায় চোখ বুজে আছে। ২০০৮ সালের Too big to fail ব্যাংকগুলো এখন অধিকতর বড় হয়েছে। ফল্ট লাইন বড় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কিন্তু আমাদের ফিনান্সিয়াল সেক্টরে এখন তাই হচ্ছে। বড় ব্যাংকগুলোকে আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যৎ-সংকট ২০০৮ সালের তুলনায় জটিলতর এবং গভীরতর হবে। নীতিনির্ধারকরা ইকুইলিব্রিয়াম মডেল ইউজ করে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে ব্যস্ত।

ফলে বিনিয়োগকারীদের প্রতি আমার পরামর্শ হচ্ছে—স্বর্ণসংগ্রহ। খুব বেশি মাত্রায় না। যদি আমি ভুল হই, তবে আপনার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে না। কিন্তু যদি আমি সঠিক হই, তবে আপনি এবং আপনার সম্পদ বেঁচে যেতে পারে। কেউ বলতে পারেন—স্বর্ণ যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়

তবে ৫০% বা ১০০% বিনিয়োগই কেন স্বর্ণ নয়? উত্তর হচ্ছে সব সম্পদ একই পণ্যে বিনিয়োগ করা বিচক্ষণতার পরিচয় নয়। সংকটকালের অপেক্ষা না করে এখনই সাধ্যমতো স্বর্ণ কিনে রাখুন। তারপর নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনার তরল সম্পদের ১০ ভাগ স্বর্ণের জন্য বরাদ্দ রাখুন। এবং তা 'নিরাপদ' স্থানে রাখুন। অতঃপর পপকর্ন নিয়ে বসে যান—'খেলা' দেখতে।

* * *

!

বই সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন

বইটি

- ○ পড়া যেতে পারে
- ○ পড়ার অযোগ্য
- ○ পড়া প্রয়োজন

বইটি আপনার চিন্তা জগতে

- ○ কোনো পরিবর্তন আনেনি
- ○ হালকা পরিবর্তন এনেছে
- ○ আলোড়ন তুলেছে

বর্তমান বিশ্ব অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে

- ○ আপনি আগে যা জানতেন তা-ই পুনরাবৃত্ত হয়েছে
- ○ কিছু নতুন তথ্য দিয়েছে
- ○ আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পরিবর্তন করেছে

আপনার আশপাশের, পরিচিতজনদের বইটি

- ○ পড়া উচিত নয়
- ○ পড়া যেতে পারে
- ○ অবশ্যপাঠ্য

বইয়ের একটা রিভিউ

- ○ দেওয়া ভালো
- ○ দেওয়া উচিত
- ○ অবশ্যই দেওয়া প্রয়োজন

অনুবাদক পরিচিতি

রাকিবুল হাসান।

জন্ম নরসিংদী সদরের ভাগদী গ্রামে। এখানেই কেটেছে সবুজ শৈশব আর দুরন্ত কৈশোর। মফস্বলের ইমদাদুল উলুম ইসলামিয়া মাদরাসায় হিফজুল কোরআন সমাপ্ত করে এখান থেকেই আলেম হবার হাতেখড়ি নেন। উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা করেন বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাইতুল উলুম ঢালকানগরে। এখান থেকেই কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরীক্ষার সম্মিলিত মেধাতালিকায় ফজিলত (অনার্স) ৩য় এবং তাকমিল (মাস্টার্স) ৫ম স্থান অর্জন করেন। উচ্চতর শরিয়া আইন ও ফিকাহ অধ্যয়ন করেছেন জামিয়াতুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া যাত্রাবাড়ী থেকে। ভর্তি পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জন করে এখন পড়াশোনা করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে।

এখন পর্যন্ত তার অনূদিত বই—

: আই এস, ইনসাইড দ্য আর্মি অব টেরর

: টেন মিথস এবাউট ইজরাইল

: আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাতুস সহিহাহ (যৌথ)

: গোল্ড ইজ মানি